২। ভারতবর্ষের গ্রামাঞ্চলের দু'টি উন্নয়নমুখী প্রতিষ্ঠানের নাম লিখুন।

.....

.....

.....

৩। জনগণের অংশগ্রহণের স্তরকে উন্নীত করার তিনটি পদ্ধতি ছয় লাইনে বর্ণনা করুন।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

২৮.১০ সারাংশ

এই এককটিটে আমরা দেখলাম উন্নয়নের প্রক্রিয়া এবং জনসাধারণের অংশগ্রহণ পরস্পরের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আমরা অংশগ্রহণের নানাবিধ দিক নিয়েও আলোচনা করেছি, যেগুলি 'অংশগ্রহণ' শব্দটিকে বুঝতে সাহায্য করে। অবশেষে এই এককে আমরা বর্তমানে সীমিত অংশগ্রহণকে কিভাবে ব্যাপকতর করা যায় তার পদ্ধতি নিয়েও আলোচনা করেছি।

২৮.১১ গ্রন্থপঞ্জী

Chambers R. 1983, Rural Development : Putting the Last First, London, Longman.
Freire, P, 1970, Pedagogy of the Oppressed, Newyork : The Seabury Press.

২৮.১২ উত্তরমালা

অনুশীলনী ১

১। হ্যাঁ।

২। ক) উন্নত প্রযুক্তির অভাব।

খ) সম্পদের অভাব।

অনুশীলনী ২

১। অবদানমূলক অংশগ্রহণ বলতে বোঝায় সিদ্ধান্তগ্রহণ এবং রূপায়ণে অংশগ্রহণ। বন্টনমূলক অংশগ্রহণের অর্থ হ'ল উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সুফল সম্পর্কে মূল্যায়ণে অংশগ্রহণ।

২। ক) স্থানীয় অধিবাসী।

খ) স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

গ) পদস্থ কর্মীবৃন্দ।

ঘ) বিদেশী বিশেষজ্ঞরা।

৩। ক) গ্রামাঞ্চলের পঞ্চায়েত।

খ) শহরাঞ্চলের পৌর-প্রতিষ্ঠান।

অনুশীলনী ৩

১। অংশগ্রহণের পথে প্রধান প্রতিবন্ধক হ'ল অর্থনৈতিক দুরবস্থা, অশিক্ষা, রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও আমলাতন্ত্রের অনীহা, সংবাদ ও তথ্যের অভাব এবং সাংগঠনিক সমস্যা।

২। ক) পঞ্চায়েতী রাজ।

খ) সমবায় প্রতিষ্ঠানসমূহ।

৩। ক) আয় সৃষ্টিকারী শক্তিগুলি।

খ) উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কে তথ্যের যোগান।

গ) সম্পন্ন এবং শিক্ষিত শ্রেণীর উপর নির্ভরশীলতা দূর করা।

একক ২৯ ভারতীয় সমাজে নারীর অবস্থান

গ ঠ ন

২৯.০ উদ্দেশ্য

২৯.১ প্রস্তাবনা

২৯.২ ভারতে নারীর প্রতিষ্ঠা বা মর্যাদা

২৯.৩ ভারতীয় সমাজে নারীর অবস্থিতি সম্বন্ধে পুরাণকথা ও কল্পিত ধারণা

২৯.৩.১ নারীর দাসত্বসূচক অবস্থান

২৯.৩.২ সমাজ সংস্কার ও সমাজ সংস্কারকগণ

২৯..৩.৩ সামাজিক সমস্যাবলী এবং পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা

২৯.৪ নারীর শিক্ষাগত অবস্থান

২৯.৪.১ নারী শিক্ষার হার

২৯.৪.২ নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিকূল শক্তিসমূহ

২৯.৪.৩ নারী ও উচ্চশিক্ষা

২৯.৫ নারী ও অর্থনীতি

২৯.৫.১ নারী এবং কর্মনিযুক্তি

২৯.৫.২ নারীর কর্মনিযুক্তির সামাজিক রূপ

২৯.৫.৩ অসংগঠিত ক্ষেত্রে নারীকর্মী

২৯.৬ নারীর সামাজিক অবস্থিতি

২৯.৬.১ পরিবার ও নারীর অবস্থান

২৯.৬.২ নারী ও বিবাহ

২৯.৬.৩ নারী ও অসম লিঙ্গানুপাত

২৯.৭ মর্যাদার ক্ষেত্রে ভারতীয় নারীর পরিবর্তিত অবস্থান

২৯.৭.১ আইনগত পদক্ষেপসমূহ

২৯.৭.২ সরকারী ব্যবস্থা

২৯.৮ নারী সংগঠন ও নারী আন্দোলন

২৯.৮.১ প্রতিষ্ঠিত সংস্থাগুলির পুরূজ্জীবন

২৯.৮.২ নারী সম্পর্কে পাঠক্রম ঃ গবেষণার বিষয়

২৯.৯ সারাংশ

২৯.১০ গ্রন্থপঞ্জী

২৯.১১ উত্তরমালা

২৯.০ উদ্দেশ্য

এই বিষয় বিভাগটি পড়ে আপনার পক্ষে যা করা সম্ভব ঃ

- ভারতীয় সমাজে নারীর অবস্থিতি সম্বন্ধে বর্ণনা করা।
- নারীর অধিকার এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশে তাঁরা যেসব সুযোগ পান সে বিষয়ে আলোচনা করা।
- সমাজে নারীর অবস্থান উন্নত করতে যে সব উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে সে সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা।
- ভারতীয় সমাজে নারীর অবস্থান বিষয়ক অতিকথা এবং বাস্তব সত্য।
- ভারতীয় নারীর শিক্ষাগত এবং কর্মনিযুক্তিগত অবস্থান সম্বন্ধে বর্ণনা দেওয়া।
- নারী সংগঠন এবং নারী আন্দোলন সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া।

২৯.১ প্রস্তাবনা

বর্তমান পাঠ্যসূচীর 'একক'-এ আমরা ভারতীয় সমাজে নারীর প্রকৃত অবস্থিতি এবং তাদের যে সব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় সে সম্বন্ধে বিশদভাবে অনুসন্ধান করতে চাই। এই অনুসন্ধানের কাজে অআমরা ভারতীয় সমাজে নারীর অবস্থান সম্বন্ধে পৌরাণিক কিছু অতিকথার অসারত্ব প্রমাণ করব এবং সেই সঙ্গে আমাদের সমাজে নারীর উন্নয়ন কি ভাবে ব্যাহত হচ্ছে, সে কথাও বলব। এই 'একক'-এ আমরা আরো আলোচনা করব যে কি কি উপায়ে রাষ্ট্রীয় কর্মসূচীতে তাদের প্রকৃত অবস্থার উন্নতির ব্যবস্থা হচ্ছে এবং ভারতে নারীদের নিজস্ব সংগঠন ও আন্দোলনের মাধ্যমে এই উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়েছে।

২৯.২ ভারতে নারীর প্রতিষ্ঠা বা মর্যাদা

এই অনুশীলনীটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তৎসত্ত্বেও, ভারতের সর্বশ্রেণীর নারী সম্বন্ধে ধারণামূলক একটি চিত্র উপস্থাপিত করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট অসুবিধে আছে, কারণ এই উপমহাদেশীয় প্রেক্ষিতে নারীর প্রতিষ্ঠা বা মর্যাদা সমরূপ নয়। সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল, পারিবারিক কাঠামো, জাতি, শ্রেণী, সম্পত্তির অধিকার ইত্যাদি অনুযায়ী মর্যাদার রূপ ভিন্নতর হয়ে থাকে। শুধু তাই নয়, আমাদের সঠিকভাবে স্থির করতে হবে যে আমরা কাদের সম্বন্ধে আলোচনা করতে চাইছি। গ্রামীণ, না শহরাঞ্চলের মহিলা, মধ্যবিত্ত না নিম্নবিত্তের মহিলা, ব্রহ্মণ না তপশিলী সম্প্রদায়ের মহিলা, হিন্দু না মুসলিম সমাজের মহিলা। কারণ নারীর প্রতিষ্ঠা বা মর্যাদা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এই আর্থ-সামাজিক ও ধর্মসংস্কৃতিগত পার্থক্যগুলি গুরুত্বপূর্ণ। তবুও, অল্প পরিসরের সীমবদ্ধতা সত্ত্বেও, আমরা শহরাঞ্চলের নারীদের সম্পর্কে সম্ভবপর একটি পূর্ণাঙ্গ ছবি তুলে ধরতে চেষ্ঠা করব।

সমাজ-নিরপেক্ষভাবে নারীর মর্যাদার বিষটি অনুধাবন করা সম্ভব নয়। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যবস্থা,

রাজনীতিতে অংশগ্রহণ এবং সমাজের ভাবাদর্শ নারীর মর্যাদার বিষয়টি প্রভাবিত করে। এছাড়া, তাদের সম্পর্কে তাদের সমাজে অনুমোদিত নিয়মাবলী ও মূল্যবোধ মযাদার ভিত্তি তৈরী করে থাকে। অনেক নির্দেশবলী, অনুমোদন ও বিধিনিষেধ নারীর ক্ষেত্রে সমাজে বর্তমান যা কিনা পরিবারের বৃত্তের ভিতরে এবং বাইরে তাদের আচার-আচরণ ও গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে, নির্ধারণ করে। সমাজ আশা করে যে, একটি মেয়ে নম্র, শিষ্ট হবে; স্বর্থপর হবে না;ক্রোধ পরায়ণ হবে না। তার গতিবিধির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কৈশোর বা বয়ঃসন্ধিকাল পেরোলেই সাধারণভাবে ছেলেদের সঙ্গে তার মেশামিশি কমে আসছে এবং এটাতেই অনুমোদিত আচরণ বলে চিহ্নিত করা হয়। তার সম্বন্ধে আরো বলা হয়ে থাকে যে, তার চলাফেরা শান্ত, সংযত হবে, এবং বিবাহকে অবশ্য পালনীয় মনে করতে হবে। বিবাহ তাদের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক। এ ধরনের সামাজিক বিধিনিষেধ সম্পর্কে আমরা সকলেই কমবেশী জানি এবং এ সম্বন্ধে পরে বিস্তরিত আলোচনা করা হবে।

২৯.৩ ভারতীয় সমাজে নারীর অবস্থিতি সম্বন্ধে পুরাণকথা ও কল্পিত ধারণা

আপনি এমন বহুলোকের সংস্পর্শে এসেছেন যাঁরা আপনাকে বলেছেন যে, ভারতীয় সমাজে নারী শক্তিরূপে পূজিতা হন। সুতরাং নারীকে সম্মান করা অতি অবশ্য কর্তব্য। শুধু সম্মান নয়, নারীকে সম্ভ্রম এবং ভয়ও করতে হবে। ভারতের প্রাচীন ঋষি মনু বলেছেন 'যেখানে নারীকে সম্মান করা,হয় সেখানে দেবতারা অবস্থান করেন'। আমরা যদি আমাদের দেবদেবীদের প্রতি দৃষ্টি দিই তাহলে দেখব যে, প্রতিটি দেব-ই পূজিত হন তাঁর দেবীর সঙ্গে, যথা — শিব পার্বতীর, রাম সীতার, নারায়ণ অথবা বিষ্ণু লক্ষ্মীর, কৃষ্ণ রাধার সঙ্গে পূজীত হন। এছাড়া, লক্ষ্মী, সরস্বতীর মত দেবী আছেন যাঁরা নিজেদের অধিকারেই পূজিতা হন।

দেবদেবীর কথা বাদ দিয়েও প্রতিদিনের জীবনে আমরা নারীর শক্তির অন্য রূপায়ন দেখতে পাই। আমরা মা ও সন্তানের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা জানি। মমতা ও প্রতিপালন সংক্রান্ত মাতৃত্বের কোমল অনুভূতিগুলি নারীর আদর্শ রূপে চিহ্নিত। মা যে পুরুষের প্রেরণার উৎস এ দৃষ্টান্ত পৃথিবী বহু দেশেই দেখা গেছে, ভারতীয় সমাজেও। কিন্তু পৌরাণিক অতিকথা ও এধরণের সামাজিক রূপকথার ফলে নারী শেষ পর্যন্ত পর্যবসিত হয়েছে দুর্বল, গৃহমুখী এক প্রাণীতে। তাকে শুধুমাত্র একটি লিঙ্গের প্রতীক হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে এবং নারীসুলভ মনমোহিনীতে তার ক্ষমতা; শক্তির ব্যবহার হয় পুরুষকে আকৃষ্ট করতে। কিন্তু এসব পৌরাণিক অতিকথা ও সামাজিক রূপকথা সমাজে বাস্তব নয় সে সম্বন্ধে আমরা ধীরে ধীরে জানতে পারব।

২৯.৩.১ নারীর দাসত্বসূচক অবস্থান

তাহলে, বাস্তব অবস্থাটি কী? বাস্তব অবস্থাটি জানতে হ'লে সমাজের দিকে আমাদের পূর্ণ দৃষ্টি মেলে ধরতে হবে। অনুপুঙ্ক্ষ ভবে অনুধাবন করতে হবে সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন প্রবাদ প্রবচন, লোককথা, সুপরিচিত আদর্শমূলক পুঁথি পুস্তকগুলি। তাহলেই দেখা যাবে যে, 'নারী শক্তির আধার' এই পৌরাণিক অতিকথাটি কত অসার, কত মিথ্যা। এখানে কবি তুলসীদাসের লেখা থেকে একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরা যেতে পারে। তুলসীদাস বলেছেন, "একটি পশু, একজন গ্রামীন মানুষ, একটি ড্রাম (বাদ্যযন্ত্র) এবং একজন স্ত্রীলোককে বাজিয়ে দেখার প্রয়োজন আছে।" মনু, যাঁর কাছে নারী দেবীজ্ঞানে পূজ্য, বলেন, "নারীর স্বাতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষা থাকা উচিত নয়। নারীকে রক্ষা করবেন, যথাক্রমে, পিতা, স্বামী ও পুত্র। প্রচলিত লোককথায় ধরিত্রী/শস্যক্ষেত্র এবং বীজ বিশেষ ইঙ্গিতবহ। জন্মদাতা পিতার প্রতীক বীজ এবং শস্যক্ষেত্র, মায়ের। এখানে জন্মদাতা হিসেবে পিতার বীজের অবদানটি সূচিত করছে এবং বীজ-ই শিশুর পরিচয় বহন করে। অথচ বাস্তব প্রজনন ক্ষেত্রে পিতা-মাতার উভয়েই ভূমিকাই যে সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ তার স্বীকৃতি থাকে না। প্রচলিত গল্পকথায় প্রজনন ক্ষেত্রে পুরুষের ভূমিকাটি-

ই অধিকতর গুরুত্ব হিসেবে তুলে ধরা হয়। নারীকে গৌণ ও দুর্বল, শক্তিহীন করে দেখবার এইসব কৌশল বর্তমান। কিন্তু আমরা চিন্তা করে দেখিনা বা দেখতে চাই না যে নারীর এই দুর্বল রূপটি সমাজেরই সৃষ্ট। কারণ নারীকে কৃষিক্ষেত্রে কাজ করতে হয় এবং সেই কাজে তারা শস্যক্ষেত্রে জল-কাদার মধ্যে সুদীর্ঘ দশ ঘন্টা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে একটানা কাজ করে যায়। দুর্বল হ'লে নিশ্চয়ই তারা এই শ্রমসাধ্য কাজ করতে পারত না। আবার যখন দেখা যায় কোন মহিলা মাথায় ভারী কাঠের বোঝা নিয়ে চলেছেন, তখন তার শারীরিক শক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে কি ? দুর্বল মনে হয় তাকে ? কী শর্সক্ষেত্রে, কী অন্য কাজের জায়গায় মহিলারা ছয় থেকে আট ঘন্টা কাজ করে। দুর্বল, শক্তিহীন হলে দিনের পর দিন এই একটানা পরিশ্রম করা তাদের পক্ষে কোনমতেই সম্ভব হত না। সুতরাং, নারীর শক্তি সম্বন্ধে গল্প ও বাস্তবের ফারাক সম্পর্কে অবহিত থাকতে হবে। নারী সম্বন্ধে আরো কিছু কল্পিত ধারণা বর্তমান। একথা বলা হয়ে থাকে যে, পুরুষরাই পরিবারের অন্নদাতা। তারা বাড়ীর বাইরে গিয়ে রোজগার করে এবং নারী বাড়ীর বৃত্তেই অবস্থান করে; রোজগারের জন্য বাড়ীর বাইরে যায়না। এ ধারণা সর্বৈব ভুল। সমাজে, খুব অল্পসংখ্যক উচ্চকোটি ও উচ্চবিত্তের মেয়েরা ছাড়া, অধিকাংশ মেয়েরাই অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী। পরিবারের পুরুষ ও নারী উভয়ের রোজগারের সংসার চালান হয়। বর্তমান সময়ে দেখা গেছে যে, আমাদের দেশের ১৩ শতাংশ পরিবার নারী দ্বারা পরিচালিত। এদের মধ্যে বিধবা, স্বামী-পরিত্যক্তা, অবিবাহিতা সব ধরণের মহিলাই আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে স্বামী বর্তমান থাকা সত্বেও স্ত্রী-কেই সংসার প্রতিপালন করতে হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কিন্তু পুরুষেরা চাকরি নিয়ে মধ্যপ্রাচ্য প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে চলে যায় এবং বিদেশেই থিতু হয়। তখন স্বদেশেস্থিত পরিবারের পালনপোষণ মহিলাদের উপরই বর্তায়। এক্ষেত্রে পুরুষই অন্নদাতা, পুরুষের রোজগারেই সংসার প্রতিপালিত হয়, মেয়েরা ভোক্তা মাত্র, এ ধরণের কল্পিত ধারণার অবকাশ আর নেই।

নারী সম্বন্ধে আরো একটি কল্পিত বা গালগল্পের নিরসন হওয়া প্রয়োজন। সমাজে যৌন অত্যাচার এবং ধর্ষণের শিকার হয় মেয়েরা, একথা সকলেরই জানা আছে এবং এটাও জানা আছে যে, সব ক্ষেত্রে মেয়েদেরই উপরই দোষারোপ করা হয়ে থাকে এই বলে যে তারা পুরুষের যৌন উত্তেজনা বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে, হয় হাবেভাবে আর নয়ত তাদের পোষাক পরিচ্ছদের মাধম্যে। এখানে সঙ্গতভাবেই কয়েকটি প্রশ্ন রাখা যেতে পারে। একটি সাত বছরের মেয়ে ষাট বছরের একজন বৃদ্ধ দ্বারা ধর্ষিত হয়েছে, এমন ঘটনা বর্তমান। এক্ষেত্রে, সাত বছরের মেয়েটি কি যৌন উত্তেজনামূলক আচরণে অপরাধী ? আবার যখন শোনা যায় এবং জানা যায় যে, পুলিশের হেফাজত অর্থাৎ থানায় কোন মহিলা ধর্ষিত হয়েছে, তখন মহিলাটি কি যৌন উত্তেজক আচরণ করেছিল ? নারীর অবস্থান ভারতীয় সমাজে উচ্চে এবং সুদৃঢ় এই কল্পনার সঙ্গে বধূহত্যার মত বাস্তবের সঙ্গতি কোথায় ? বধূনির্যাতন, ধর্ষণ, শ্লীলতাহানি, যৌনলাঞ্ছনা নিয়মিত বাস্তব প্রেক্ষিতে সমাজে নারীর উচ্চস্থিতি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া সম্ভবপর হয়না।

নারীর স্থিতি সম্বন্ধে কল্পনা ও বাস্তবের চিত্রটি স্পষ্ট বোঝা যাবে যদি আমরা নারীর উপর অত্যাচার সম্বন্ধে কিছু পরিসংখ্যান এখানে উল্লেখ করি। সাধারণভাবে রাষ্ট্র, পরিবার, ধর্ম, শিক্ষা, স্বাস্থ, রাজনীতি ও কাজের জগতে বিভিন্ন ধরণের বঞ্চনা ও বৈষম্যের শিকার নারী। এর সঙ্গে যুক্ত হয় নানাধরনের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন। বহু শতাব্দের মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গী এমন এক সামাজিক কাঠামোর সৃষ্টি করেছে যেখানে নারীর স্থিতি সম্বন্ধে 'কল্পিত' ধারণার থেকে বাস্তব অবস্থা বহুগুণে করুণ ও ভয়াবহ; শোষণ, নিপীড়ন অব্যাহত। নীচের তালিকা থেকে নারীর বাস্তব অবস্থা কিছুটা আন্দাজ করা যাবে।

নারীর বিরুদ্ধে সংঘটিত বিভিন্ন অপরাধ (সারা ভারতে)

অপরাধের প্রকৃতি	সাল					%থেকে '৮৯ থেকে '৯০
	১৯৮৯	১৯৯০	১৯৯১	১৯৯২	১৯৯৩	
ধর্ষণ	৯,১৫০	৯,৫১৮	৯,৭৯৩	১১,১১২	১১,২৪২	২২.৯%
অপহরণ	১১,৬৭৩	১১,৬৯৯	১২,৩০০	১২,০৭৭	১১,৮০৭	১.৪%
যৌতুকের জন্য বধূহত্যা	৪,২১৫	৪,৮৩৬	৫,১৫৭	৪,৯৬২	৫,৮১৭	৩৮.০%
নির্যাতন	১১,৬০৩	১৩,৪৫০	১৫,১৪৯	১৯,৭০৫	২২,০৬৪	৯০.২%
শ্লীলতাহানি	২০,৪৯৭	২০,১৯৮	২০,৬১১	২০,৩৮৫	২০,৯৮৫	২.৪%
ইভটিজিং	৯,৯৩৪	৪,৬২০	১০,২৮৩	১০,৭৫১	১২,০০৯	২০.৯%
মোট	৬৭,০৭২	৬৮,৩১৭	৭৪,০৯৩	৭৯,০৩৭	৮৩,৯৫৪	২৫.৯%

১৯৯৪ সালে ভারতে নারী নির্যাতনের বিভিন্ন ঘটনার মোট সংখ্যা ছিল ৮২,৮১৮। (সূত্র ঃ ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস্ ব্যুরো)

১৯৯০-৯৪ সালের মধ্যে শিশুধর্ষণের ঘটনা সারা ভারতে বেড়েছে ৮০ । এসব পরিসংখ্যান থেকে আমরা খুব সহজেই এই সিদ্ধান্ত পৌঁছতে পারি যে, নারীর স্থিতির কাল্পনিক আখ্যান ও বাস্তব এক নয়। উপরের পরিসংখ্যান আরো সংক্ষিপ্ত করে বলা যায় যে ভারতে

প্রতি ৫৪ মিনিটে একটি করে ধর্ষণ হচ্ছে
প্রতি ২৬ মিনিটে একটি করে শ্লীতাহানির ঘটনা ঘটছে
প্রতি ৪৩ মিনিটে একটি করে অপহরণ হচ্ছে
প্রতি ৯০ মিনিটে একটি করে বধূহত্যা হচ্ছে
প্রতি ৩৩ মিনিটে একটি করে নারী নিগৃহীতা হচ্ছে
প্রতি ৭ মিনিটে একটি করে নারীর বিরুদ্ধে ফৌজদারী অপরাধ ঘটেছে

২৯.৩.২ সমাজ সংস্কার ও সমাজ সংস্কারকগণ

সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর বাস্তব অবস্থা কি ? এ বিষয়টি পর্যালোচনা করার আগে আমাদের মনে একটি প্রশ্ন জাগে — 'কেন আমরা সাম্প্রতিক কালে নারীর অবস্থান সম্বন্ধে এত ঔৎসুক্য দেখাচ্ছি ? এই ঔৎসুক্য কিন্তু একান্ত সাম্প্রতিক নয়। উনবিংশ শতাব্দতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে (এখনকার রাজ্য) বিভিন্ন সমাজ সংস্কারকগণ মুক্ত ভাবধারার আবহে এবং বুদ্ধির মুক্তির সূত্রে স্ত্রী-পরুষের সামাজিক সমতার প্রশ্নে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। সহমরণ-এর মত নিষ্ঠুর ধর্মীয় সামাজিক প্রথা তাঁদের ব্যথিত ও বিচলিত করেছিল। এক পুরুষের বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকায়, বিশেষ করে কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে, স্বামীর মৃত্যুতে একাধিক স্ত্রী-কে সহমরণ বরণ করতে হ'ত। ১৭৯৯ সালে শতাধিক বিবাহের জনৈক স্বামীর মৃত্যুতে ৩৭ জন বিধবা সহমৃতা হন। তিন দিন ধরে চিতা প্রজ্জলিত রাখতে হয়েছিল। ১৮০৩-১৮০৪ সালে শ্রীরামপুর মিশনের উইলিয়ম কেরী-র তত্ত্বাবধানে সতীদাহ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা হয়। সমকালীন সময়ে রাজা রামমোহন রায়; পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা রাধাকান্ত দেব প্রমুখ মনীষীদের প্রচেষ্টায় ১৮২৯ সালে এই জঘন্য প্রথা বিলোপের ব্যবস্থা হয়। কুলীন প্রথা বা বহুপত্নীত্ব প্রথাও অপসারিত হয়। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রযত্নে বাল্যবিবাহ রোধ এবং বিবাহের অনুমোদন সূচক আইন

পাশ হয়। রাজা রাধাকান্ত দেব তাঁর ''স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক'' রচনাটির মাধমে এদেশে নারীর শিক্ষা বিস্তার প্রয়াসে অগ্রণী হন। এসব বরেণ্য ব্যক্তিত্ব ছাড়াও অজস্র সভাসমিতি ও পত্রপত্রিকা নারীর সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের ব্যাপারে গভীর ঔৎসুক্য ও আগ্রহ প্রকাশ করে। ১৬-১২-১৮৩৭ তারিখের ''জ্ঞানান্বেষণ'' পত্রিকায় আমরা একটি উল্লেখনীয় রচনা পাই ঃ

''জগদীশ্বর স্ত্রী-পুরুষ নির্মাণ করিয়া এমত কখনও মনে করেন নাই যে
একজন অন্যজনের দাস হইবে কিংবা একজন অন্যকে নীচ বলিয়া গণ্য
করিবে। ..... কিন্তু মনুষ্যের শঠতাক্রমে এই সকল বাধাজনক শৃঙ্খল হইয়াছে,
ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে নহে।''

ফলে, এদেশের নারীর শিক্ষার বিষয়টি এসব সমাজ-সংস্কারকদের মনে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে এবং এরই সূত্রে ১৮৪৯ সালে বেথুন স্কুলের প্রতিষ্ঠা হয়। মহিলারা কিন্তু জড় পুতুলের মত অবস্থায় ছিল না। সমাজ-সংস্কারের ঢেউ তাদের হৃদয়ের তটেও অল্পবিস্তর আঘাত করেছিল। এ বিষয়ে প্রমাণ পাওয়া যায় ''চুচুড়া নিবাসী স্ত্রীগণস্য'' স্বাক্ষরিত ১৮৩৫ সালের ১৫ই মার্চে লেখা এক সংবাদপত্রের চিঠিতে। মহিলাদের ছয়টি দাবী ছিল ঃ

১। সভ্যদেশীয় স্ত্রীগণের ন্যায় বিদ্যাধ্যয়নের অধিকার,
২। স্বচ্ছন্দভাবে অন্যদেশীয় স্ত্রীলোকের ন্যায় সকলের সঙ্গে আলাপ পরিচয়,
৩। বলদ বা অচেতন দ্রব্যের ন্যায় হস্তান্তরিত না হওয়া,
৪। কন্যা বিক্রয় বন্ধ করা,
৫। বহুবিবাহ রহিত করা,
৬। বিধবার পুনর্বিবাহ

বেথুন বালিকা বিদ্যালয় কলকাতা শহরের স্থাপিত হয়েছিল। গ্রামাঞ্চলের মহিলারাও যাতে শিক্ষার আলো পান সেজন্য পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিশেষ উদ্যোগ নেন। তাঁর প্রচেষ্টায় বাংলার গ্রামাঞ্চলে সহস্রাধিক মহিলা বিদ্যালয়ের পত্তন হয়।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও বিভিন্ন সমাজ-সংস্কারগণ, যথা মহারাষ্ট্রে মহাদেব গোবিন্দ রানাডে, গোপাল হরি দেশমুখ এরফে ''লোকহিতবাদী'', জ্যোতিবা ফুলে প্রভৃতি ধর্ম ও জাতপাতের উর্দ্ধে উঠে নারীজাতির মর্যাদা বৃদ্ধি করতে সদা সচেষ্ট ছিলেন। ''প্রার্থনা সভা'', ''মানবধর্ম সভা'', ''সত্যশোধক সমাজ'' প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এঁরা সমাজ-সংস্কারে ব্রতী ছিলেন। উত্তর ভারতের দয়ানন্দ সরস্বতীও সমাজ-সংস্কারে তাঁর স্বাক্ষর রেখে গেছেন। এসব সমাজ-সংস্কারে এদেশীয় নারীজাতির অবস্থার উন্নয়ন ও মর্যাদা বৃদ্ধি অন্যতম লক্ষ্য ছিল এঁদের। শুধু সতীপ্রথা নিবারণ, বাল্যবিবাহ রোধ, বিধবাদের পুনর্বিবাহ এধরণের আইন প্রণয়নে সহায়তা করেই এঁরা এঁদের কাজ শেষ করেননি। নারী শিক্ষার বিষয়টি এঁদের সমাজ-সংস্কার কর্মসূচীতে অগ্রাধিকার পায়। ১৮৯১ সালে সহবাস সম্মতি আইন বা The Age of Cousent Bill পাশ হয়। এই আইনে বিবাহিতা মেয়েদের সহবাসের বয়স ১০ থেকে ১২-তে উন্নীত করা হয়।

সমাজ-সংস্কারকদের এই বিভিন্ন প্রয়াসের ফলে এদেশের মহিলারাও নিজেদের নব মূল্যায়ণে আগ্রহী হন। তাঁরা উপলব্ধি করেন নিজেদের Caged Bird বা খাঁচাবদ্ধ বিহঙ্গের অবস্থাটি। ফলে কলকাতায় স্থাপিত ১৮৪৯-এর বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের পর বাংলার গ্রামগঞ্জেও শিক্ষার আগ্রহ বাড়তে থাকে। মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত

বিভিন্ন সভাসমিতির মূল উদ্দেশ্য ছিল মেয়েদের শিক্ষা ও অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা। গত শতকের অতি বিখ্যাত "বামাবোধিনী পত্রিকা"-র মতে ১৮৭০ থেকে ১৮৭২ সালের মধ্যে বাংলার মফঃস্বল শহরে এবং গ্রামাঞ্চলে মহিলাদের দ্বারা বহু সভাসমিতি স্থাপিত হয়েছিল। তাদের মধ্যে কয়েকটি সভা-সমিতি যথা, বরিশাল ফিমেল ইমপ্রুভমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন, দ্য সিলেট সম্মিলনী, দ্য বিক্রমপুর সমিমিলনী সভা, ফরিদপুর সুহৃদ সভা, বাখরগঞ্জ হিতসাধিনী সভা, দ্য যশোর-খুলনা ইউনিয়ন, টাকি হিতকারী সভা, শ্রীরামপুর হিতসাধিনী সভা, বিশেষ গুরুত্বের দাবী রাখে। কলকাতার বাইরে মফঃস্বল এলাকার এসব সভাসমিতি নারীজাগরণ ও নারী উন্নয়নের সহায়ক হয়েছিল। এসব এলাকার শিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টা কীভাবে সুদূরপ্রসারী ফল দিয়েছিল সে সম্বন্ধে আমরা একটু পরেই আলোচনা করছি।

কলকাতায় বেথুন বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হতেই বাংলার শহরাঞ্চলে মহিলাদের শিক্ষার আগ্রহ উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পায়। ফলে, বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ে পাঠ শেষ করে তাঁরা উচ্চতর শিক্ষার দিকে যেমন, চিকিৎসা-বিদ্যায় ঝুঁকে পড়লেন। এইভাবে শহরাঞ্চলে কলকাতা, বোম্বাই, দিল্লী ইত্যাদি স্থানে — একটি মহিলা বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর জন্ম হয়। ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এর প্রতিষ্ঠা হলে এই বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর কিছু মহিলা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্বন্ধে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। কিন্তু এঁরা সকলেই উচ্চবর্ণ ও উচ্চবিত্তের মহিলা ছিলেন।

১৯১৪-১৯১৭ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ইতিহাসের একটি মাইল ফলক। ভারতেরও এ যুদ্ধের ফলে প্রভূত আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের সূত্রপাত হয়। যুদ্ধ শেষ হবার অব্যহিত পরেই অর্থনৈতিক কারণে বহু নারীকে পারিবারিক ও সামাজিক অবরোধ উপেক্ষা করে অর্থোপার্জনের ভূমিকায় নামতে হয়। নারীর অবগপণ্ঠন মুক্তির ক্ষেত্রে ওই সময়কার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হ'ল দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে মোনহদাস করমচাঁদ গান্ধীর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন এবং রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে ভারতীয় নারীদের স্বাধীনতা সংগ্রামে সামিল হবার উদাত্ত আহ্বান জানানো। এ ঘটনা ১৯২০ সালের পরবর্তী সময়ে। ফলে, শহরে, নগরে, গ্রামে, গঞ্জে সাড়া পড়ে যায় মেয়েদের মধ্যে দেশের জন্য 'কে বা আগে প্রাণ করিবেক দান'। আমরা আগেই জেনেছি যে, কলকাতার বাইরে বাংলার মফঃস্বল শহরে, গ্রামাঞ্চলে মহিলাদের প্রচেষ্টায় শিক্ষা ও আত্মনির্ভররতার প্রদীপ দ্বলেছিল মৃদুভাবে। এবার মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর-র উদাত্ত আহ্বানে সে প্রদীপের শিখা উর্ধগামী হ'ল। মাঠে ময়দানে বেরিয়ে এল তারা ঘোমটা, বোরখা ছেড়ে, নতুন সামাজিক প্রতিষ্ঠার আকর্ষণে। লবণ সত্যগ্রহে অংশগ্রহণ করে, উগ্রপন্থী আন্দোলনে সামিল হয়ে, 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে নারী তার বলিষ্ঠ স্বাক্ষর রাখল দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে। অজস্র প্রাণের বিনিময়ে তারা অর্জন করেছিলেন এ দুর্লভ সম্মান।

দেশ স্বাধীন হয় ১৯৪৭ সালে। স্বাধীন ভারতের সংবিধান চালু হ'ল ১৯৫০ সালে। সেই সংবিধানে আমরা পেলাম পুরুষ ও নারীর সমতার অঙ্গীকার। এই সমতার কথা কিভাবে সংবিধানে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে সে বিষয়ে কিছু জেনে রাখা ভাল। সংবিধানে ১৪ ধারায় বলা হয়েছে যে, ভারতের ভূখণ্ডে রাষ্ট্র আইনানুগ ভাবে কোন ব্যাক্তির সমতা খর্ব করবে না। ১৫(৩) ধারায় নারী ও শিশুদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের অনুমোদন আছে। ১৬(১) ধারা অনুযায়ী সরকারী চাকরীর ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের সমান অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। লিঙ্গের ভিত্তিতে বৈষম্যমূলক আচরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ১৯ ধারা সকল নাগরিকদের স্বাধীনতার অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছে। ২১ ধারায় আমরা পাই প্রতিটি মানুষের জীবনের অর্থাৎ বেঁচে থাকার অধিকার। ২৩ ধারায় সমস্ত শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার। ৩৯(খ) ধারা অনুযায়ী পুরুষ ও নারীকে সম্পর্কে বলা হয়েছে। ৪২ ধারা অনুযায়ী প্রতিটি মালিককে কাজের মানবিক শর্তাবলী পূরণ ও প্রসূতিদের সম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ সুনিশ্চিৎ করতে হবে।

৫১(ক) ধারায় একথা অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলা হয়েছে যে, ভারতের প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য হ'ল নারীর মর্যাদার পরিপন্থী যে কোন আচরণ থেকে বিরত থাকা প্রাথমিকভাবে ভারীতয় সংবিধানে নারীর সমতা সম্বন্ধে এধরণের ব্যবস্থা ছিল। সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এবং পরিবর্তিত পারিপার্শ্বিকে এবং ভারতের আধুনিকীকরণে নারীর অংশগ্রহণকে কেন্দ্রে করে সংবিধানে নতুন ধারা সংযোজিত হচ্ছে; সংবিধান সংশোধন করা হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, হারীর পঞ্চায়েতে অংশগ্রহণের প্রেক্ষিতে সংবিধান সংশোধন করা হয়েছে।

সংবিধানে নারী ও পুরুষের সমতা সম্বন্ধে এসব ধারা সংযোজনের ফলে সাধারণ মানুষের মনে, বিশেষ করে নারীদের মনে, একটি অঅশার সঞ্চার হয়েছিল যে যুগাতিযুগের বৈষম্য, অবরোধ, অবনমন, লাঞ্ছনার দিন বুঝি শেষ হতে চলেছে নারীর ক্ষেত্রে। তাছাড়া, সরকারী কাজে উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন নারীদের নিয়োগ, যেম, রাষ্ট্রদূত হিসেবে বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, রাজ্যপাল হিসেবে সরোজিনী নাইডু, সাংসদ হিসেবে রেণু চক্রবর্তী, কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়, কেন্দ্রীয়মন্ত্রী সিসেবে রাজকুমারী অমৃত কাউর, ফুলরেণু গুহ প্রমুখ নারীদের কিছুটা হয়ত বিভ্রান্তও করেছিল যে তাদের অগ্রগতির পথে আর কোন বাধা থাকল না; নিষ্কটক হ'ল পথ। দীর্ঘদিন ধরে তারা যে সংগ্রাম করে এসেছে, আন্দোলন চালিয়েছে, তার বুঝি আর প্রয়োজন নেই। সংবিধানের মাধ্যমে সব মুস্কল আসান হবে। বিদেশের মহিলাদের মত ভারতের মহিলাদের আর ঝাণ্ডা বহন করতে হবে না পথে পথে।

কিন্তু ১৯৭৪ সালে Towards Equality বা সমতার লক্ষ্যে এই ষ্টেটাস রিপোর্টটি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল যে আমাদের দেশে নারীরা যে তিমিরে ছিল সে তিমিরেই আছে। ভারতের নারীর অবস্থিতি বা নর্যাদা সম্বন্ধে এটি একটি প্রামাণ্য দলিল। এ সম্বন্ধে পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

২৯.৩.৩ সামাজিক সমস্যাবলী এবং পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা

গত অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, ভারতে নারীর অবস্থিতির বিষয়টি নিয়ে এদেশে মানুষের মধ্যে, নারীদের মধ্যে কিছু ভ্রান্ত ধারণা বর্তমান ছিল। দেশবাসী মনে করেছে যে, ভারতীয় সংবিধান চালু হবার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝি পুরুষ ও নারীর মধ্যে অতীতের বৈষম্য, বঞ্চনার অবসান হবে। কার্যত দেখা গেল যে, বৈষম্য, বঞ্চনার অবসান দূরের কথা, নারী সম্বন্ধে নতুন করে হচ্ছে। আদিবাসী ও তপশিলীজাতিভুক্ত নারীদের নিগ্রহ শোচনীয় আকার ধারণ করেছে। কি অর্থনৈতিকভাবে, কি শারীরিকভাবে তারা উচ্চবর্ণের মানুষের নির্যাতন, নিপীড়নের শিকার হচ্ছে। এ সম্বন্ধে দৃষ্টান্তের অবধি নেই। এই পরিস্থিতিতে ভারতে নারীর সঠিক অবস্থান মূল্যায়নের জন্য ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কামিটিকর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শ্রীযুক্তা ফুলরেণু গুহ। দীর্ঘ পরিশ্রম ও অনুসন্ধানের পর সারা ভারতে জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায় নির্বিশেষে নারীর অবস্থিতি বিষয়ক Towards Equality বা "সমতার লক্ষ্যে" শীর্ষক দলিলটি ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত হয় এবং ১৯৭৫ সালে সংসদে দাখিল করা হয়। প্রসঙ্গত, ১৯৭৫ সালটি 'আন্তজার্তিক মহিলা বৎসর' হিসেবেও চিহ্নিত। 'আন্তর্জাতিক মহিলা বৎসর' সম্বন্ধে একটু পরেও বিসদ আলোচনা করা হবে। "সমতার লক্ষে" দলিলটি সংসদে পেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই সারাভারতে, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে, তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি হয় কারণ ঐ দলিলে পরিবেশিত তথ্যাদি সম্বন্ধে দেশের জনগণ একেবারেই অবহিত ছিল না। তারা এতাবৎকাল "মুর্খের স্বর্গে" বাস করেছে চোখ কান বন্ধ করে। ফলে, নারীদের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক শোষণ, নিপীড়নের সমস্ত কাহিনী, তথ্য তাদের অগোচরেই থেকে গেছে অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে এ সম্বন্ধে তারা কোন খোঁজ খবর নেবার ঔৎসুক্য বা দায়িত্ব বোধ করেনি। "সমতার লক্ষ্যে" দলিলটি দেশবাসীকে দীর্ঘদিনের আয়েসী নিদ্রা থেকে জাগিয়ে দিল। ১৯৭৫ সাল থেকেই শুরু হ'ল

এদেশে নারীর অবস্থিতির মূল্যায়ণের নতুন পর্ব। এটি একটি উল্লেখযোগ্য প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের মাইল ফলক। ১৯৭৫ সালটি আর্ন্তজাতিক নারীবর্ষ হিসেবে চিহ্নিত হওয়ায় ভারতে নারীর এই নবমূল্যায়ণ প্রচেষ্টা একটা নতুন মাত্রা পেল, জোর বাড়ল এই প্রয়াসের।

এখন আমরা 'আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ' ১৯৭৫ যা কিনা আন্তর্জাতিক নারী দশক ২০০-এ প্রসারিত হয়, সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করব। ভারতের মত এত তীব্র, তীক্ষ্ম না হলেও, পৃথিবীর সবদেশেই, কি উন্নত, কি উন্নতিশীল সমাজে নারীর অবস্থিতি নিম্নমানের। দীর্ঘ ২০০ বছর ধরে ইউরোপের মহিলারা তাদের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ে অবিরল সংগ্রাম করে চলেছে। ফরাসী বিপ্লবের সময় থেকে তাদের এই সচেতনতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। ফরাসী বিপ্লবে "আঁসিয়ান রেজিম" বা সনাতনী ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়লে জনগণ ফরাসী পার্লামেন্টের কাছে তাদের স্বাধীনতার সনদ "Declaration of the Rights of Man" পেশ করে। এই সনদে নারীর দাবীদাওয়া সম্বন্ধে কোন উল্লেখ ছিল না। এখানে উল্লেখ্য যে ফরাসী বিপ্লব সফল করতে নারীদের অগ্রগণ্য ভূমিকা ছিল। উপরোক্ত সনদ শুধুমাত্র পুরুষদের সনদ এই অভিযোগ তুলে ফরাসী বিপ্লবের কিছু নায়িকা তৈরী করল তাদের "Declaration of the Right of Woman" এবং ফরাসী পার্লামেন্টে পেশ করতে প্রয়াসী হ'ল। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম হ'ল ওলিম্পিয়া গুজে। কিন্তু মহিলাদের এই আবেদন ফরাসী পার্লামেন্ট গ্রহণ করা দূরে থাক, নেত্রীবৃন্দকে জেলবন্দী করে, অমানুষিক নির্যাতন ক'রে তাদের জীবনান্ত করে। কিন্তু ইতিহাস মনে রেখেছে এদের এবং এদেরই অনুপ্রেরণায় ইংলণ্ডে নারীদের। দাবীদাওয়া সম্বন্ধে আন্দোলনকারী মহিলাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মেরী ওলষ্টোন ক্রাফ্‌ট্। ইংলণ্ডে নারীদের। দাবীদাওয়া সম্বন্ধে কেন আন্দোলনের প্রয়োজন হয়েছিল এ কথা জানতে ঔৎসুক্য থাকা স্বাভাবিক বলে কিছুটা আলোচনা করা হচ্ছে এখানে। রাজনীতির ক্ষেত্রে ঊনবিংশ শতকের ইংলণ্ডে মেয়েদের ভোটাধিকার ছিল না; তারা নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে দাঁড়াতে পারত না; কোন সরকারী চাকরিতে নিয়োগ করা হ'ত না তাদের; তারা কোন রাজনৈতিক সংগঠনে অথবা কোন রাজনৈতিক সমাবেশে যোগ দিতে পারতে না। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীরা কোন সম্পত্তির অধিকারী হতে পারত না; কোন ব্যবসায়ে যুক্ত থাকতে পারত না; ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলতে পারত না; নিজেদের নামে কোন ঋণ নিতে পারত না। সামাজিক ক্ষেত্রে নারীর কোন আইনী সত্ত্বা ছিল না, আইনের দৃষ্টিতে তাদের অপ্রাপ্তবয়স্ক বা শিশু বলে গণ্য করা হত। আইনের দৃষ্টিতে তারা ছিল নিম্নমানের সাক্ষী; ডিভোর্স করার অধিকারও তাদের দেওয়া হ'ত না; শিক্ষার ক্ষেত্রে ছিল চরম বৈষম্য, প্রাথমিক শিক্ষার গণ্ডী পেরোনো তাদরে ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ ছিল। অথচ, বিগত দুই আড়াই শতকে ইংলণ্ডে মানবাধিকার অর্জনের সূত্রে অনেক আন্দোলন হয়েছে।

এই বি-সম পরিস্থিতিতে ইওরোপের নারীরা সমতার লক্ষ্যে তাদের আন্দোলন অক্লান্ত ভাবে চালিয়ে গেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তাদের এই আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে এবং তা' ইওরোপের গণ্ডীতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। সমতার অনুপ্রেণা জোরদারভাবে এসেছে পূর্বতন সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে যেখানে নারী ও পুরুষের অধিকার সমানভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সমতার লক্ষ্যে, নারীবিদ্বেষহীন সমাজগঠনের লক্ষ্যে সারা পৃথিবীর নারী এবার একাত্ম হ'ল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালীন আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হ'ল ১৯৪৮ সালে ইউনাইটেড নেশনস্ কর্তৃক গৃহীত Declaration of Universal Human Rights অর্থাৎ সারা বিশ্বজনীন মানবিক অধিকারের সনদ। এই সনদের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সংযোজন হ'ল CEDAW (CONVENTION FOR THE ELIMINATION OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN) অর্থাৎ নারীর বিরুদ্ধে বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত সমঝোতা। রাষ্ট্রপুঞ্জের এসব ব্যবস্থার সূত্র ধরে সারা পৃথিবীতে নারী আন্দোলন অত্যন্ত জোরদার হয়ে ওঠে এবং নাইরোবি (আফ্রিকা)-র মহিলা সম্মেলনে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং নারীর অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে ও মর্যাদা বৃদ্ধির প্রশ্নে সারা বিশ্বের মহিলারা অন্দোলন করে যাবে এবং ১৯৭৫ সালকে আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ ও ১৯৭৫-২০০০ সাল পর্যন্ত

সময়কে নারীদশক হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে। এই জাগরণ, এই আন্দোলনের ঢেউ ভারতে এসে পৌঁছয় এবং বেসরকারী, সরকারী সমস্ত সংস্থা, প্রতিষ্ঠান নতুনভাবে জেগে ওঠে এবং কর্মসূচীগ্রহণ করে নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নারী আন্দোলন অব্যাহত আছে এবং ব্যাপকতর আকার ধারণ করছে। ১৯৯৫ সালে সমাজতন্ত্রী চিন-এর পেইচিং শহরে চতুর্থ আন্তর্জাতিক নারী মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং নারীর অধিকার সম্বন্ধে উদার কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। এই কর্মসূচীর সামিল হতে ভারত অঙ্গীকারবদ্ধ।

অনুশীলনী ১

১। সমাজে নারীদের অবস্থিতি সম্পর্কে যে কাল্পনিক ধারণা আছে তার সঙ্গে বাস্তবের যোগাযোগ কতটা? সাত লাইনে এই প্রশ্নের উত্তর দিন।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

২। উনবিংশ শতকের কয়েকজন সমাজ সংস্কারকের নাম করুন যাঁরা সর্বপ্রথম এদেশে নারীর বি-সম অবস্থিতির প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন। পাঁচ লাইনে উত্তর দিন।

.....

.....

.....

.....

.....

৩। ভারতীয় নারীর অবস্থিতি সম্বন্ধে আশাবাদ ও আত্মতুষ্টি কিভাবে সাম্প্রাতিককালে বিনষ্ট হয়েছে? কারণ বিশ্লেষণ করে ছয় লাইনে উত্তর দিন।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

২৯.৪ নারীর শিক্ষগত অবস্থান

"Towards Equality" বা সমতার লক্ষ্যে দলিলটি প্রকাশিত এবং সাংসদে পেশ করার সঙ্গে সঙ্গে এদেশে নারীর শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সামাজিত অবস্থিত নিয়ে নতুন করে পর্যালোচনা ও গবেষণা শুরু হয়ে যায়। এদিকে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের সমৃদ্ধি, উন্নতি ও আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে শিক্ষার অগ্রণী ভূমিকা ও শিক্ষায় নারীদের ব্যপকভাবে অংশগ্রহণের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। নারীর শিক্ষা সম্বন্ধে শতাব্দব্যাপী যে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও ভ্রান্ত পরিবেশ ও মানসিকতা বর্তমান ছিল তার অবসান করা প্রয়োজন একথা সর্বসাধারণে স্বীকৃত হ'তে শুরু হ'ল। উনিশ শতকে অবশ্য ভবিষৎদৃষ্টি সম্পন্ন সমাজ-সংস্কারকেরা নারীর শিক্ষার বিষয়েঅগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাঁদের প্রযত্নে বহু প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কলেজ স্থাপিত হয়েছিল যা কিনা শুধুমাত্র শিক্ষা সম্বন্ধে উদ্যোগী ছিল। "লেখাপড়া শিখলে মেয়েরা বিধবা হবে"—এই অসত্য ধারণাটি মেয়েদের মধ্যেও বদ্ধমূল হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু সমাজ-সংস্কাবকদের একান্ত প্রচেষ্টায় এবং শিক্ষায়তনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় মেয়েরা ক্রমে ক্রমে এই অসাড় ভাবধারা থেকে মুক্ত হতে আরম্ভ করে। এছাড়া শিক্ষার যে একটা অর্থনীতিগত মূল্য আছে সে সম্বন্ধে তারা ধীরে ধীরে সজাগ হতে থাকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরপরই বিশ্বব্যাপী মন্দা-র কারণে ভারতের অর্থনীতির ক্ষেত্রেও এক বিরাট সংকট এসে পড়ে। কলকারখানায় শ্রমিক ছাঁটাই, সরকারী কর্মচারীদের বেতন থেকে দশ থেকে পনের শতাংশ কাটা ইত্যাদির ফলে দেশে এক গভীর অর্থনৈতিক সংকট দেখা যায়। এই পরিস্থিতিতে শিক্ষিত মহিলারা শিক্ষকতা ক্ষেত্রে কিছু চাকরী পায়। শিক্ষার এই আশু ফললাভে তারা উৎসাহিত বোধ করে, ব্যাপকতর সংখ্যায় শিক্ষা গ্রহণে উদ্যোগী হয়। এই উদ্যোগে ছেদ পড়েনি এবং তা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখন মহিলারা শুধু প্রাথমিক শিক্ষাই নয়, উচ্চতর শিক্ষা, চিকিৎসাবিজ্ঞান, ভৌতবিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও শিক্ষাগ্রহণ করছে এবং দেশের আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে এ শিক্ষা ফলপ্রসু হচ্ছে।

২৯.৪.১ নারী শিক্ষার হার

নারীর শিক্ষাগ্রহণের ক্ষেত্রে অনুকূল বাতাবরণ সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষক্ষেত্রে তারা তেমন সিদ্ধি অর্জন করতে পারেনি। সার্বজনীন শিক্ষা-র তো প্রশ্নই ওঠেনা। ১৯৯১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী ভারতে সাক্ষর নারীর অনুপাত ছিল ৩৯.১৩ শতাংশ। এই অনুপাত অবশ্য বিভিন্ন রাজ্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মাত্রার। কেরলে শতকরা ৭৩ জন নারী শিক্ষিত। এটি যেমন একটি দৃষ্টান্তমূলক অবস্থা, অন্য কিছু রাজ্যে সাক্ষর নারীর সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। রাজস্থান, বিহার, মধ্যপ্রদেশ (সংক্ষেপে বিমারু) রাজ্যগুলিতে ১০-১২ শতাংশ নারী সাক্ষরতা অর্জন করেছে। রাজ্যগতভাবেই নয়, অঞ্চল, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণীগতভাবেও নারীর সাক্ষরতার হার বিভিন্ন এবং নিম্নমানের। এছাড়া, জনসংখ্যার হার যত বৃদ্ধি পাচ্ছে, শিক্ষাজগৎ থেকে নারী তত বাদ পড়ে যাচ্ছে। সর্বশেষ আদমসুমারীতে দেখা গেছে ৬-১১ বছরের মেয়েদের ৪৫ শতাংশ, ১২-১৪ বছরের মেয়েদের ৭৫ শতাংশ এবং ১৫-১৭ বছরের মেয়েদের ৮৫ শতাংশ "বিদ্যালয় ছুট" বা School Dropout অর্থাৎ তারা হয়ত কোন সময়ে স্কুলে ভর্তি হয়েছিল কিন্তু পড়াশুনা চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়নি। প্রাথমিক স্তরের পড়াশুনা শেষ হবার আগেই ৫০ শতাংশ মেয়ে বিদ্যালয় ছুট হয় বা হতে বাধ্য হয়। তুলনামূলকভাবে, মাধ্যমিক পর্যায়ে যেখানে ছেলে পড়ুয়াদের অনুপাত ৬৩ শতাংশ মেয়ে পড়ুয়ারা মাত্র ৩৬ শতাংশ। ছেলে ও মেয়ে পড়ুয়াদের মধ্যে এই ফারাক কিন্তু মেয়েদের কোন বুদ্ধিবৃত্তির অভাবজনিত কারণে নয়, কারণটা আর্থসামাজিক ও সংস্কৃতিগত।

২৯.৪.২ নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিকূল শক্তিসমূহ

একটু আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, শিক্ষাসম্বন্ধে আগ্রহ থাকলেও আর্থসামাজিক ও সংস্কৃতিগত কারণে মেয়েদের শিক্ষা ব্যাহত হয়ে থাকে। নিম্নবিত্ত ও গ্রামীন পরিবারে একটি কন্যা শিশুকে (৬-১১ বছর বয়স) সংসারে বহু কাজকর্ম করতে হয় যেমন, ছোট ভাইবোনদের আগলান, টিউবওয়েল অথবা পুকুর থেকে জল আনা, জ্বালানী সংগ্রহ, ঘরের

কাজে মাকে সাহায্য করা, পরিবারের অসুস্থ আত্মীয়দের দেখা শোনা করা ইত্যাদি। সরেজমিনে একটি সমীক্ষা করে দেখা গেছে যে, নিম্নবিত্ত পরিবারের একটি মেয়েকে (৬-১১ বছর বয়সের) সকাল ৫টা থেকে রাত্রি ১১টা পর্যন্ত বিশটি বিভিন্ন ধরনের সাংসারিক কাজ করতে হয়। ফলে, তার স্কুলে যাবার প্রয়োজন কেউ অনুভব করে না। সাময়িকভাবে স্কুলে গেলেও তাকে আবার ঘরের কাজ করবার জন্য স্কুল থেকে ছাড়িয়ে আনা হয়। ছেলেদের ক্ষেত্রে ভাবনাটা একটু অন্য রকম। ছেলেকে লেখাপড়া শেখাতে হবে কারণ সে বড় হয়ে বাবা, মা-র প্রতিপালন করবে। মেয়েদের সম্বন্ধে হীনমন্যতার একটি আবহ থাকায়, যা কিনা বিভিন্ন গ্রামীন প্রবাদে পরিস্ফুট ও স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তাদের শিক্ষার বিষয়টি গৌণ হয়ে দাঁড়ায়। এখানে বাংলার গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত কয়েকটি প্রবাদ তুলে ধরা হচ্ছে। এসব থেকেই স্পষ্ট হবে যে সংসারে মেয়েরা কতটা আদৃত এবং কতটা বর্জনীয়।

১। সাতরাজার ধন ব্যাটা
মেয়ে গলার কাঁটা

২। মেয়ে হয়ে জন্ম নিলি
আঁতুড়েই কেন না মরলি!

৩। যার নাই মেয়ে
সে বড়লোক সবার চেয়ে।

৪। ব্যাটা করবে পড়াশুনা
মেয়ে শিখবে ঘরকন্না।

৫। ছেলের বেলায় রূপার থালা
মেয়ের বেলায় হেলাফেলা।

৬। কন্যা যাবে পরের ঘরে
মানুষ করব কি?

৭। ব্যাটার ঘরের নাতি
স্বর্গে দেবে বাতি।

৮। মেয়ে হলে আয়ু কমে
বাবা মা-কে টানে যমে।

পরিবারে, সমাজে মেয়েদের হীনাবস্থার চিত্র এসব প্রবাদে অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। মেয়েরা যে 'lesser child' এসব প্রবাদে তা অত্যন্ত স্পষ্ট। জনকজননীর কাছেও কন্যাসন্তান আপন ঘরের নয়, পরের ঘরের। সুতরাং কন্যাসন্তান সম্বন্ধে তাদের দায়িত্ব ন্যূনতম। এ অবস্থায় পরিবারে মেয়েদের পড়াশুনার বিষয়টিও ন্যূনতম গুরুত্ব পেয়ে থাকে। বরং তারা যদি খন্ডকালীন কাজ করে যেমন, অন্যের বাড়ীতে ঘরমোছা, বাসন ধোওয়া ইত্যাদি, মা বাবাকে আর্থিক সাহায্য দেয়, তাহলে সেটাই বেশী কাম্য হয় মা বাবার কাছে। তাছাড়া, বাল্য বিবাহ প্রথা মহা আড়ম্বরে বহাল থাকায় এবং দৈনন্দিন জীবনে মেয়েদের চলাফেরা অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় মেয়েরা স্কুলে যাওয়া অর্থাৎ শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে বাড়ীর কাছাকাছি স্কুল থাকে না। ৩/৪ মাইল পথ হেঁটে যেতে হয় স্কুলে পৌঁছতে। আবার বাড়ীর কাছাকাছি স্কুল যদি বা থাকে, শিক্ষিকার অভাবে ঐসব স্কুলে বাবা-মা মেয়েকে পাঠাতে অনিচ্ছুক হন, কিংবা স্কুলে মেয়েদের পাঠালেও, অতি শীঘ্র ছাড়িয়ে আনতে দ্বিধা করেন না। এসব বাস্তব প্রতিকূলতা ছাড়াও কিছু অন্য ধরণের প্রতিকূলতা বর্তমান। পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত গল্পকাহিনীগুলি অধিকাংশক্ষেত্রেই ছেলেদের গুণকীর্তন ধর্মী হয়ে থাকে। পাঠ্যবিষয় ও শিক্ষক-শিক্ষিকা উভয়ই পুরুষপ্রাধান্য বিষয়ের উপর গুরুত্ত আরোপ করে মেয়েদের বুদ্ধিশক্তি সম্বন্ধে কটাক্ষপাত করে, যেমন বিজ্ঞানে মেয়েদের দক্ষতা ছেলেদের থেকে অনেকাংশে কম অথবা মেয়েরা গণিত শাস্ত্র বিমুখ

হয়। একমাত্র রান্নাঘরেই মেয়েদের বিকাশ সুচারুভাবে হতে পারে ইত্যাদি ধরনের গৎবাঁধা অভিমত মেয়েদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করান হয়। জ্ঞানের কোন ক্ষেত্রেই যে মেয়েরা পুরুষদের চেয়ে ন্যূন নয় তা নানাভাবে প্রমাণিত হয়েছে। সুদীপ্তা সেনগুপ্তার দক্ষিণ মেরু অভিযান, কল্পনা চাওলার মহাশূন্যে পাড়ি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহিলাদের অসামান্য অবদান প্রমাণ করছে যে, মেয়েদের সম্বন্ধে সাবেক কালের গৎবাঁধা অভিমতের দিন শেষ হয়েছে। সুযোগ পেলে ও সহায়তা পেলে মেয়েরা নিশ্চিতভাবে সমান শিক্ষার সুব্যবহার করতে পারে এবং সফল হয়। স্কুলে কলেজের পাঠ্যবস্তুতে মেয়েদের সম্বন্ধে যেসব কাল্পনিক এবং গৎবাঁধা অভিমত আছে, সেই লিঙ্গভিত্তিক বিচারগুলি অগ্রাহ্য করে নতুন পাঠ্যবিষয় লেখার চেষ্টা চলেছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষাদপ্তর এবং সংশিষ্ট শিক্ষা আয়োগগুলি, যথা NCERT এই লিঙ্গ সূচক পাঠ্যবিষয়গুলি বদল করার কাজে উদ্যোগ নিয়েছে।

২৯.৪.৩ নারী ও উচ্চশিক্ষা

নারী ও উচ্চশিক্ষা-এই ক্ষেত্রটি কিছুটা ব্যতিক্রমী। আঞ্চলিক পার্থক্য সত্ত্বেও শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে কলেজীয় শিক্ষা একটি প্রচলিত ব্যাপার। ১৭-২৩ এই বয়সী মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাগ্রহণের অনুপাত ৩ শতাংশ। তুলনামূলকভাবে, ঐ অনুপাত ছেলেদের ক্ষেত্রে এমন কিছু আশাব্যঞ্জক নয় অর্থাৎ৫ শতাংশ। সার্বিক তালিকায় মেয়েদের অনুপাত ৩০ শতাংশের মত। এ থেকে দু'টি সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে। প্রথমত, উচ্চশিক্ষা উচ্চবিত্তের মেয়েদের পক্ষেই সম্ভব এবং দ্বিতীয়ত, উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত এসব মেয়েরা তাবৎ কুসংস্কারের বন্ধনমুক্ত হয়ে ক্রমাগত এগিয়ে যাবার চেষ্টা করে থাকে।
তবে উচ্চশিক্ষার পথ এসব নারীদের পক্ষে সুগম হলেও বিভিন্ন বিষয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুষঙ্গিক কাঠামো অপরিবর্তিত থাকায়, মেয়েদের উচ্চশিক্ষায় ভর্তি হতে বাধার সৃষ্টি হয়। মেয়েদের মধ্যে মানবিকী বিদ্যার প্রতিই আকর্ষণ বেশী। কিন্তু বানিজ্য বিষয়ক শিক্ষায়ও মেয়েরা আগ্রহ দেখাচ্ছে। মাত্র কয়েক বছর আগেও ইনজিনিয়ারিং, স্থাপত্য, আইন প্রভৃতি বিভাগে ছাত্রীর সংখ্যা মুষ্টিমেয়ই ছিল। কিন্তু বর্তমানে ঐ সব বিভাগে ছাত্রী সংখ্যা অনেকগুণ বেড়েছে। চিকিৎসাবিদ্যায়ও মেয়েদের আগ্রহ বাড়ছে। পাশ্চাত্য দেশের মত আমাদের দেশে এ বিষয়টির অধ্যয়ন ও অনুশীলন নিন্দনীয় নয়। কারণ আজ থেকে শতবর্ষ আগে আনন্দীবাই যোশী, অবলা বসু (বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর স্ত্রী) বিদেশ থেকে চিকিৎসাবিজ্ঞান পড়ে এসেছিলেন। তবে বর্তমানে চিকিৎসাবিজ্ঞান অধ্যয়নে আমাদের দেশে একটি বিরাট অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে, তা হল পঠনেচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীকে এক মোটা অঙ্কের মাশুল (Capital Fee) দিয়ে শিক্ষায়তনে ভর্তি হতে হয়। এবং এই ব্যবস্থাটি ক্রমবর্ধমান ও স্থায়ী রূপ নিতে চলেছে যদিও এর বিরুদ্ধে ভারত সরকারের আইন বলবৎ আছে।
এখানে একটি সঙ্গত প্রশ্ন তোলা যেতে পারে — মেয়েদের ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা কি? শিক্ষার অভিজাততন্ত্রী প্রকৃতি এবং অত্যন্ত কঠিন প্রতিযোগিতামূলক বিয়ের বাজারের প্রেক্ষিতে, কলেজ নামক প্রতিষ্ঠানগুলিকে ঠিক বিদ্যাবিতরণ ও বিদ্যাঅর্জনের সংস্থা বলা যায় না। অথবা চাকরির জন্য প্রকৌশল অর্জনের কেন্দ্রও বলা যায়না। অধ্যাপক শ্রীনিবাসের সুরে সুর মিলিয়ে বরং বলা যেতে পারে যে, কলেজগুলি, হ'ল বিবাহেচ্ছুক মেয়েদের জন্য একটি উৎকৃষ্ট প্রতীক্ষালয়। তাছাড়া, সংবাদপত্র ও অন্যান্য মাধ্যমগুলি, বিশেষ করে বাণিজ্যিক ফিল্মগুলি, এখনও শিক্ষিতা মেয়েদের সন্দেহের চোখে দেখে। তার সঙ্গে যুক্ত থাকে কিছু নঞর্থক চারিত্রক বৈশিষ্ট্য যথা, আক্রমণাত্মক মনোভাব, দুর্বিনীত এবং অসৎ। এক কথায়, পিতৃতান্ত্রিক সমাজ-কাঠামোতে, নারীর শিক্ষগত উৎকর্ষ যা-ই হোক না কেন, তাকে নির্ভরপরায়ণ হতেই হবে। ফলে, শিক্ষাক্ষেত্রে মেয়েদের অবস্থিতি এক উভয় সঙ্কটের সৃষ্টি করে। এ কারণে শহরভিত্তিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নারী শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও স্বাধীন ব্যক্তিত্বের দাবী করতে পারে না।

২৯.৫ নারী ও অর্থনীতি

শিক্ষার্থী বন্ধু, অর্থনীতির ক্ষেত্রে নারীর অবদান সম্বন্ধে এবার আলোচনা করা হবে। শিক্ষার ক্ষেত্রে যেসব সমস্যা প্রকট হয়নি অর্থনীতির ক্ষেত্রে তা অনেক বেশী করে প্রকট হয়েছে। একথা ঠিক নয় যে, নারীর কর্মে নিযুক্তি সাম্প্রতিক

কালের ঘটনা। স্মরণাতীত কাল থেকেই তারা পরিবারকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য অর্থকরী কাজ করে এসেছে এবং তাদের এই ভূমিকা সমাজ মেনেও নিয়েছে। সাবেকী গ্রামীন অর্থনীতিতে কর্মরত কৃষক, দক্ষকারিগর এবং চাকরবাকর শ্রেণীর কাজে, উৎপাদন ও বেচাকেনার কাজে নারী অসামান্য ভূমিকা পালন করে এসেছে। সাম্প্রতিককালে, যেখানেই সাবেকি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু আছে, বিশেষত দরিদ্র কৃষিজীবী, তফশিলী সমাজ এবং উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে নারী আগের মতই কাজ করে চলেছে। আপনি নিশ্চয়ই তাদের ঝুড়ি বোনা, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, মাছ ও সবজী বিক্রি প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত থাকতে দেখেছেন। দরিদ্র স্বামীদের ক্ষেতের জমি তৈরীর কাজ এবং অন্যান্য কাজেও দেখে থাকবেন। অর্থনীতির আধুনিক শাখার সম্বন্ধে বলা যেতে পারে যে, শিল্পোদ্যগের প্রাথমিক স্তরে বস্ত্রশিল্পে, পাটশিল্পে এবং খনি ও বাগিচা শিল্পে মেয়েদের অংশগ্রহণ স্বীকৃত হয়েছিল। ১৮৮৪ সালে বোম্বাই বস্ত্রশিল্পের যাবতীয় শ্রমিকদের মধ্যে নারীশ্রমিকই ছিল এক চতুর্থাংশ। এদের ৮০ শতাংশ সূতা পেঁচানো এবং ২০ শতাংশ সূতা কাঠিমজাত করার কাজে নিযুক্ত থাকত।

২৯.৫.১ নারী ও কর্মনিযুক্তি

কয়েকটি কারণে নারীর কর্মক্ষেত্রে নিয়োগ বিষয়টি সংশয়পূর্ণ।

প্রথমত, নারীর বহু কাজই অপ্রত্যক্ষ থেকে যায় অর্থাৎ দৃষ্টির আড়ালে সম্পন্ন হয়ে থাকে। কারণ, তারা বাড়ীর গন্ডিতে কাজ করে, গরু বাছুরের রাখালি করে, চাষের কাজে স্বামীকে সাহায্য করে, রান্নাবান্না করে, জল, জ্বালানী সংগ্রহ করে। কিন্তু এসব কাজের কোন হিসেব রাখেনা কেউ। বলা হয় যে, তারা বাড়ীর কাজেই নিযুক্ত। এসব কাজ থেকে যা আয় হতে পারে বা হয়, তার কোন ভাগ পায় না মহিলারা। আদমসুমারী বা Census -এর হিসেব অনুযায়ী কৃষিখাতে ৭৫ শতাংশেরও বেশী এবং কৃষি বর্হিভূত খাতে ৩৮ শতাংশ নারী "যোগাড়ে" হিসেবে কাজ করে। Census কর্মচারীরা এসব নারীদের 'কী কাজ করা হয়?" এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে তাদের একমাত্র জবাব থাকে "ঘরের কাজ"। এসব নারীরা কত যে বিভিন্ন ধরনের উৎপাদনশীল কাজে দিনের পর দিন অতিবাহিত করে সে সম্বন্ধে নারীবাদী অর্থনীতিবিদেরা এক পদ্ধতি প্রকাশ করতে বিশেষ যত্ন নিচ্ছেন। আরেকটি উদ্বেগের বিষয় হ'ল কর্মরত শ্রমিক সংখ্যায় নারীদের অংশগ্রহণের হার ক্রমশ কমে যাচ্ছে। ১৯০১ সালে সমগ্র নারী জনসংখ্যার ৩১.৭০ শতাংশ ছিল নারীকর্মী। ১৯৮১ সালে এই হার ২০.৮৫ শতাংশে নেমে যায়। অনুরূপভাবে, ১৯০১ সালে প্রতি ১০০০ পুরুষ প্রতি নারীকর্মী ছিল ৫০৪, ১৯৮১ সালে ঐ সংখ্যা ৩৬৭-তে হ্রাস পায়।

আদমসুমারীতে তালিকাভুক্ত হবার আগে অধিকাংশ নারীশ্রমিক বা Main Worker হিসেবে কাজ করেছে। প্রান্তিক কর্মী তাদেরই বলা হ'ত যারা বছরের যে কোন একটি সময়ে কাজ করেছে এবং যারা বছরের কোন সময় একবারের জন্যও কাজ করেনি তাদের অ-কর্মী Non-Worker বা বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের নারীকর্মী যথা, যোগড়ে, প্রান্তিককর্মী এবং অনিয়মিত কর্মীর তালিকা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, প্রায় ৭৫ শতাংশ নারী "অসংগঠিত" ক্ষেত্রে কাজ করে। এর অর্থ হ'ল নারীকর্মীরা নিরাপদ নয়; শ্রমনিবিড় প্রযুক্তি ব্যবহারকারী প্রতি,ঠানের ক্ষেত্রে আইন দ্বারা সুরক্ষিত নয়, তাদের দিনের দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করতে হয় কিন্তু পারিশ্রমিক অত্যন্ত নগণ্য। এ বিষয়ে বিশদ বিবরণ নিচের সারণি বা Table থেকে পাওয়া যাবে। যদিও এই পরিসংখ্যান ১৯৮১-র আদমসুমারীতে প্রাপ্ত তথ্য থেকে তৈরী, তবু মহিলাদের কর্মে নিযুক্তি সম্বন্ধে একটি সাধারণ ধারণা এই সারণি থেকে করা সম্ভব।

১৯৮১-তে শিল্পক্ষেত্রে শ্রেণীগতভাবে প্রধান, প্রান্তিক ও সমগ্র (প্রধান + প্রান্তিক) নারী শ্রমিকদের শতকরা হারের বন্টন

শিল্পক্ষেত্রের শ্রেণী	প্রধান কর্মী		প্রান্তিক কর্মী		সমগ্র কর্মী		
	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	শ্রমিক	পুরুষ	নারী
মোট	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
(১) চাষী	৪৩.৭০	৩২.২০	৪১.৬৬	৪৭.৯১	৪২.০৬	৪৩.৬৬	৩৭.৫০
(২) কৃষি শ্রমিক	১৯.৫৬	৪০.১৮	৩৩.২৯	৪১.৪৩	২৬.৩১	১৯.৮৩	৪৪.৭৯
(৩) প্রাণীজ সম্পদ বনজ সম্পদ মৎস্য সম্পদ চাষ আবাদ বাগিচা এবং অনুরূপ কাজকর্ম	২.৩৪	১.৮৫	৩.৬৮	১.৬৪	২.২২	২.৩৭	১.৭৯
(৪) খনি ও খনিখাত	০.৬২	০.৩৬	০.২৫	০.০৬	০.৫২	০.৫১	০.২৭
(৫) গঠন, প্রস্তুতকরণ, মেরমতি কুটিরশিল্প ও অন্যান্য শিল্প	৩.১৮	৪.৫৯	৩.০৩	৪.০৭	৩.৫১	৩.১৮	৪.৪৪
	৮.৯২	৩.৫৫	৫.৩৪	২.১৫	৭.৩৭	৮.৮৫	৩.১৪
(৬) নির্মাণ	১.৮১	০.৪০	১.৯৫	০.৩৯	১.৫২	১.৮১	০.৬৮
(৭) ব্যবসা বাণিজ্য	৭.৩৩	২.০৪	৪.৮৬	১.০৪	৫.৮৪	৭.২৮	১.৭৫
(৮) পরিবহণ, মজুতকরণ/ যোগাযোগ	৩.৩২	৩.৩৮	১.৭১	০.০৬	২.৫১	৩.২৯	০.২৯
(৯) অন্যান্য পরিষেবা	৯.২২	৭.০৫	৪.২৩	১.২৫	৮.১৪	৯.১২	৫.৩৫

চটকল ও সূতাকলে আগে নারীশ্রমিক ছিল ২৫ শতাংশেরও বেশি, বর্তমানে এই সংখ্যা ৫ শতাংশেরও কম। বাগিচা শিল্পে ১৯৭২ সালে নারীশ্রমিকের সংখ্যা ২৫ হাজার কমে যায়। এখন আরও কমে গেছে। কয়লাখনিতে ওয়াগন বোঝাই করার কাজে ৫০ হাজার ছাঁটাই হয়ে গেছে। তামাক শিল্পের শ্রমিকদের মধ্যে অধিকাংশই নারী। এই শিল্পে যন্ত্র ব্যবহারের ফলে অন্ধ্রপ্রদেশের তিনটি কেন্দ্রে ১৫ হাজার নারীশ্রমিক ছাঁটাই হয়েছে। এই সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে নারীশ্রমিক কৃষিতে কাজ পেয়ে থাকে বছরে ৬ মাস, মজুরি খুবই সামান্য। কৃষিতে যন্ত্রপাতি আমদানির ফলে প্রচুর নারীশ্রমিক বেকার হচ্ছে। পুরুষের সমান, এমন কি বেশী কাজ করলেও, নারীশ্রমিককে পুরুষ শ্রমিকের সমান মজুরি দেওয়া হয় না। নারীর শ্রম-অংশগ্রহণের পরিমাণ হ্রাস ও তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেছে যে, ভৌগলিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপাদান ছাড়াও একটি বড় ভূমিকা রয়েছে প্রযুক্তির পরিবর্তন বা Technological Change-এর। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কৃষিকাজে নিড়ানির কাজ (weeding) ছিল প্রধানত নারী কৃষি শ্রমিকদেরই । ঢেঁকিতে ধান ভানার কাজ ছিল তাদের একচেটিয়া। কিন্তু আধুনিক প্রযুক্তিতে আগাছানাশক রাসায়নিক এবং ধান ভানার মেশিন তাদের অনেকাংশে স্থানচ্যুত করেছে এবং সেখানে জায়গা করে নিয়েছে, সংখ্যায় স্বল্প হলেও, পুরুষ শ্রমিকেরা। আবার আরেকটি ব্যতিক্রমী ঘটনাও চোখে পড়ে। উচ্চ ও মধ্য বর্ণের পরিবারে, যারা ব্যবসা এবং কৃষক ও সম্পন্ন পরিবার গোষ্ঠীতে আছেন, অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সেখানে মেয়েদের শ্রমক্ষেত্র বা চাকরি থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়। মেয়েদের কাজ করাটাকে পরিবারের মর্যাদাহানিকর বলে মনে করা হয়। অধ্যাপক

শ্রীনিবাস এই ঘটনাটিকে "improvement of women at the top" বলে সনাক্ত করেছেন। ভারতীয় সমাজে উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান এবং ঘরের বাইরে গিয়ে চাকরী করা (extramural work) ঠিক সঙ্গতিপূর্ণ নয়। উচ্চবর্ণের মহিলারা এবং গ্রামাঞ্চলের সংস্কৃতায়ন প্রাপ্ত (sanskritised) মহিলারা এই "মর্যাদা ফাঁদ" -এর শিকার হয়ে থাকে।

২৯.৫.২ নারীর কর্মনিযুক্তির সামাজিক রূপ

নারীর শ্রমনিযুক্তি সম্বন্ধে উপরে বর্ণিত চিত্রটি থেকে শহরাঞ্চলের মধ্যবিত্ত মহিলাদের কর্মনিযুক্তির চিত্রটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। শহরাঞ্চলে যা হামেশাই চোখে পড়ে তা' হল ভদ্রসভ্য (white collared job) কাজে মহিলাদের বেশিমাত্রায় যোগদান। শহরাঞ্চলে জীবনযাপনের ব্যয় বৃদ্ধি, শিক্ষার সুযোগ এবং সামাজিক পরিবর্তনের ফলেই পূর্বতন বিধিনিষেধ অনেকাংশে শিথিল হয়েছে এবং সে কারণেই মহিলারা তৃতীয় পর্যায়ের (Teriary Sector) বিভিন্ন চাকরী ও পেশায় যোগ দিতে সক্ষম হচ্ছে। এসব পেশা ও চাকরির দরজা আগে তাদের জন্য রুদ্ধ ছিল। সরকারী ও বেসরকারী খাতে প্রশাসনিক চাকরির সংখ্যা বাড়ার ফলে শিক্ষিত কর্মচারীর চাহিদাও অনেক বেড়ে গেছে। উন্নয়নমূলক এবং কল্যাণমূলক কাজের ক্ষেত্রেও বৈজ্ঞানিক, প্রকৌশলী, চিকিৎসাশাস্ত্রে অভিজ্ঞ এবং আধাভেষজবিদ্‌দের (Para-medical) জন্য রাস্তা খুলে গেছে। দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষকতা পেশাই সমাজে গ্রহণীয় ছিল এবং সেটি যদি কোন মহিলা কলেজে পাওয়া যায় তাহলে তো কথাই নেই। এই কাজে বেশি ঘোরাঘুরি করতে হয়না, কাজের জায়গায় পুরুষদের সঙ্গে মিশবার অবকাশ কম, গ্রীষ্মাবকাশ ইত্যাদি, নারীর সনাতন সন্তান পালনের ভূমিকার-ই নামান্তর মাত্র। অনেক সমীক্ষা থেকে জানা গেছে যে, বহু নতুন ক্ষেত্রে নারী কাজ করতে সক্ষম। আবার অনেক কাজ আছে যা কিনা নারীর জন্য "নিষিদ্ধ" বা Tabooed। তবে ভবিষ্যতের নতুন নতুন সমীক্ষায় জানা যাবে যে, তাদের কর্মক্ষেত্র ও কর্মনিযুক্তি সম্বন্ধে বিধি নিষেধ অনেক শিথিল বা "flexible" হয়েছে অর্থাৎ পূর্বেকার গোঁড়ামি কমেছে।

অসংগঠিত ক্ষেত্রে নারীর কর্মনিযুক্তির নিহিতার্থ বা Implication সম্বন্ধে আলোচনা করার আগে আমাদের লক্ষ্য হবে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত নারী শ্রমিকেরা। বিবাহিতা ও কর্মরতা হয়েও তারা কিন্তু পুরুষ প্রধান পিতৃতান্ত্রিক সমাজেরই অঙ্গ। ফলে, তাদের কাজ হাজার মর্যাদাপূর্ণ ও আর্থিকভাবে লোভনীয় হলেও, তারা কিন্তু পারিবারিক অর্থাৎ নারীসুলভ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পায় না। পরিবার সংক্রান্ত বিভিন্ন সমীক্ষায় এসব তথ্য পাওয়া যাবে। সমাজ এখনও মনে করে যে, সমাজে নারীর ভূমিকা মুখ্যত গৃহস্থালী অথবা Home-making -এর।

২৯.৫.৩ অসংগঠিত ক্ষেত্রে নারীকর্মী

সম্প্রতিকালে, অসংগঠিত ক্ষেত্রে উন্নতির জন্য বহুবিধ চেষ্টা হয়েছে। বেশীর ভাগ সময়ই দেখা যায় যে, নারী অ-কৃষিখাতে, ছোটখাটো ব্যবসায়ে স্বনিযুক্ত হয়ে, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণে অথবা পোষাক তৈরী, বিড়ি বাঁধা, চুড়ি তৈরী, ইমারতী কাজে, যন্ত্রাংশ সন্নিবেশের কাজে, প্যাকিং-এ নিযুক্ত থাকে। নিপানি-র তামাক চাষে, অথবা লেস তৈরীতে নিযুক্ত নারী শ্রমিকদের দুরবস্থার কাহিনী টিলিভিশনের অবাণিজ্যিক তথ্যচিত্রের মাধ্যমে দেখান হয়েছে। এইসব বিড়ি শ্রমিকেরা ভোর না হতেই বাড়ী থেকে বেরিয়ে ৫/৬ মাইল পথ হেঁটে পৌঁছয় কাজের জায়গায়। ফিরে আসতে সন্ধ্যা পেরিয়ে যায়। শিল্পমালিকরা নারী শ্রমিকদেরই পছন্দ করে, কারণ অল্প পয়সায় তাদের নিয়োগ করা যায়, সহজে ধোঁকা দেওয়া যায় এবং মেয়েরা ইউনিয়নবাজি করে না। আর ক্ষুদ্র এবং অসংগতি ক্ষেত্রের অছিলায় মালকেরা এদের প্রাপ্য বহু সুযোগ সুবিধা যথা, প্রসূতি ছুটি ও ভাতা, ক্রেশ এবং ন্যূনতম মজুরী থেকে বঞ্চিত করে। বাণিজ্যের মুক্তঞ্চল (Free Trade) এবং রপ্তানী প্রবর্ধক অঞ্চল (Export Promotion Zones) গুলিতে এসব দুর্নীতির বাড়বাড়ন্ত দেখা যায়। কান্ডুলা মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চলে, যেখানে পোষাক তৈরী, পশমবোনা, ইলেকট্রনিক ইত্যাদির ছোট ছোট কারখানা আছে, লাইসেন্সবিহীন কনট্রাকটরেরা সিংহভাগ নিয়োগের কাজটি করে থাকে। অধিকাংশ নারীকর্মী ২০ বছরের কম বয়সী

এবং অবিবাহিত। তাদের কাজের দিন শুরু হয় ভোর ৪টে থেকে এবং শেষ হয় রাত্রি ১০টায়। তাদের আবার বাড়ীর কাজও করতে হয়।

এখানে বলা প্রয়োজন যে, শ্রেণী, বর্ণ যা-ই হোকনা কেন ঘরের কাজের দায়িত্ব নারীরই। পরিবারের মধ্যে লৈঙ্গিক শ্রম-বিভাজনের চেহারা অতি প্রকট ও স্পষ্ট। ঘরে এবং বাইরে দু' জায়গার কাজের বোঝা বহন করে নারী শ্রমিকের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। সংক্ষেপে বলা যায়, অর্থনীতি যেভাবে অগ্রসর হচ্ছে তাতে বাইরের কাজে নারীর সুযোগ আসলেও, তাদের জীবনযাত্রা অত্যন্ত কঠোর এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ন্যায্য পাওনা থেকে তারা বঞ্চিত।

২৯.৬ নারীর সামাজিক অবস্থিতি

শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের অবস্থান সম্বন্ধে আলোচনার সময় আমরা দেখেছি যে তাদের সম্পর্কে কি যুক্তিযুক্ত সমাজের এই ধারণাটিই তাদের সেই ক্ষেত্রে প্রবেশের পথ নির্ধারণ করেছে। ঐ সব বিধিনিষেধের মোদ্দা কথাটি হ'ল নারীর প্রাথমিক ভূমিকা গৃহে এবং গৃহস্থালীতে, গৃহের প্রয়োজনে এবং নিজের ব্যক্তিগত অভিরুচি, জীবিকা, পেশা সেক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পেতে পারেনা। আমরা পরিবার ও বিবাহ পদ্ধতি সম্বন্ধে এখন আলোচনা করব।

২৯.৬.১ পরিবার ও নারীর অবস্থান

ভারতে পিতৃতান্ত্রিক এবং মাতৃতান্ত্রিক দুই ধরনের পরিবার বর্তমান থাকলেও পিতৃতান্ত্রিক এবং যৌথ পরিবারের-ই প্রাধান্য বর্তমান। প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ ডঃ ইরাবতী কার্ভে যৌথপরিবার সম্বন্ধে এই সংজ্ঞা দিয়েছেন "একটি জনসমষ্টি, যারা সাধারণত এক ছাদের নীচে বাস করে, একই রান্নাঘরের রান্না খেয়ে থাকে, যৌথভাবে সম্পত্তির অধিকারী হয়, পারিবরিক পূজাপার্বণে অংশগ্রহণ করে এবং একে অন্যের সাথে কোন না কোন আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ থাকে।" ভারতের সর্বত্র এই ধরণের যৌথ পরিবার বর্তমান এমন কি বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রাদায়, যথা মুসলমান ও খ্রীষ্টানদের মধ্যেও যৌথ পরিবার দেখা যায়। উচ্চবর্ণ ও ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর মধ্যে যৌথ পরিবার প্রথা আরো ব্যাপক। অবশ্য ক্রমবর্ধমান নগরায়ন ও শিল্পয়নের সঙ্গে সঙ্গে যৌথ পরিবার আদর্শগতভাবে যতটা বর্তমান, ব্যবহারিক ভাবে যৌথ বসবাস ততটা প্রাধান্য পায়না।

স্বামীর গৃহে বসবাস সহ পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে বিবাহের পর নারী লিঙ্গ সমতার সেরকম একটি সুষ্ঠু পরিবেশ পায়না। পিতৃতান্ত্রিক যৌথপরিবারে শাশুড়ী এবং ননদের হাতে বধূদের কীরকম নিগ্রহ, নির্যাতন হয় এসব কাহিনী বহু লোকগাথায় ও গানে অমর হয়ে আছে। ঐ পরিবারে বধূরা সম্পূর্ণভাবে শাশুড়ী ও ননদের কর্তৃত্বাধীন। কর্মরতা নারীদের ক্ষেত্রে যৌথপরিবারে নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে একটি ভাসাভাসা ধারণা আছে যে, তাদরে সংসারের দায়িত্ব তেমন একটা পালন করতে হয় না। কিন্তু বিশদ অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে এসব ক্ষেত্রে যৌথপরিবার তিন প্রজন্মের পরিবার নয়, বরং কোন দম্পতির সঙ্গে হয় পিতা, নয়ত মাতা বাস করছেন।

২৯.৬.২ নারী ও বিবাহ

নারীর জীবনে বিবাহ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। শাস্ত্রমতে বিবাহ-ই একমাত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠান নারীর পক্ষে। এছাড়া, সমাজ যখন নারীর সতীত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করে, দাম্পত্য সম্পর্কের স্থায়িত্ব সেখানে অত্যন্ত মূল্যবান। বৈধব্য, বিবাহ-বিচ্ছেদ, একক নারীজীবন পুরুষের লোভ লালসার লক্ষ্যস্থল হয়ে উঠতে পারে। নারীর পক্ষে বিবাহ বাধ্যতামূলক সন্দেহ নেই কিন্তু তাদের অধিকতর অবমূল্যায়ণের ক্ষেত্র হ'ল পণপ্রথা। কোন কোন গোষ্ঠীর মর্যাদা পরম্পরায় (status hierarchy) কন্যাপক্ষের মর্যাদা পাত্রপক্ষের মযওাদার চেয়ে কম। কোন বিশেষ বর্ণে মেয়ের বিবাহ দিতে হ'লে বাবা-মাকে পাত্র বা পাত্রপক্ষকে যথেষ্ট পরিমাণে নগদ টাকা ও অন্যান্য

সামগ্রী দিতে হয়। এইসব দানসামগ্রী ও যৌতুক উভয়পক্ষের মার্যাদা বৃদ্ধিকর বলে মনে করা হয়। দুটি দেহ ও মনকে মেলবার পক্ষে এটি একটি প্রকাশ্য বাণিজ্যিক লেনদেন ছাড়া আর কী হতে পারে? নারী অবশ্যই সমাজের যূপকাষ্ঠে বলিদান বই নয়! সমাজের আধুনিকীকরণে এই প্রথা কিছু মাত্র কমেনি বরং বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। উচ্চশিক্ষিত সরকারী চাকুরে, উচ্চবেতনে উচ্চ পেশায় নিযুক্ত পুরুষেরা আকাশছোঁয়া পণ দাবী করে। মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ের বিয়েতে বর্তমানে লক্ষাধিক টাকা দরকার হয়। সবচেয়ে পরিতাপের বিষয় হ'ল যে, উচ্চশিক্ষিত ও চাকুরীরতা মেয়ের বিয়েতেও পণ দিতে হয় বাবা-মাকে। এবং এই হুমকি দেশের সর্বত্র দাবানলের মত বিস্তার লাভ করছে। একসময় পণ দেওয়া-নেওয়াকে সামাজিক কুপ্রথা হিসেবেই গণ্য করা হ'ত। বিশেষ করে উত্তর ভারতে এবং উচ্চবর্ণের মধ্যে। বর্তমানে এ ধরনের সীমারেখা আর নেই। পণপ্রথা দারিদ্রশ্রেণীর মধ্যেও অনুপ্রবেশ করেছে। ফলে, মর্যাদা বৃদ্ধি করতে এবং কন্যা বিক্রির ব্যাপারটি আইনুনুগ করতে বাবা-মাকে এখন পণ দিতে হচ্ছে। এতে কি প্রমাণিত হয়? প্রমাণিত হয় নারী সম্বন্ধে গোটা সমাজের চূড়ান্ত অমানবিক মনোভাব এবং নতুন প্রজন্মের চরম বৈষয়িক অভিরুচি। নারীর নিম্ন অবস্থানের আরও ভয়ঙ্কর ও নিষ্ঠুরতম প্রমাণ হ'ল পণপ্রথার বলি হিসেবে বধূমৃত্যু। পাত্রপক্ষের বাড়ীর লোকেদের এবং স্বামীদেরও লোভের কোন মাত্রা না থাকায় যৌতুক ও দান সামগ্রীর জন্য প্রতিনিয়ত নববধূকে বিব্রত হ'তে হয়। অন্যদিকে, সম্মান, মর্যাদা, 'ইজ্জত' এর দোহাই দিয়ে নির্যাতিতা কন্যার বাবা-মাও পরিবারে তাকে আশ্রয় দিতে চায় না। ফলে, কোথাও কোন জায়গায় শান্তি ও আশ্রয় না পেয়ে সে বাধ্য হয় আত্মহত্যায় অথবা তাকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করা হয়। সমাজে নারীর অবস্থান সম্পর্কে পণপ্রথাজনিত মৃত্যু এক নির্মম ভাগ্য ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে।

২৯.৬.৩ নারী ও অসম লিঙ্গানুপাত

সমাজে নারীর নিম্নমানের অবস্থানের আরেকটি সূচক হ'ল লিঙ্গানুপাতের বৈষম্য। সাধারণভাবে জনসংখ্যার লিঙ্গানুপাত নির্ধারিত হয় জৈবিক ও সামাজিক কারণ দ্বারা। সাম্প্রতিককালের একটি অত্যন্ত চাঞ্চল্যকর ঘটনা হ'ল যে, এদেশে জন্মসময়ে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের টিকে থাকার সম্ভবনা কম। এটি কিন্তু অন্যান্য দেশে ঘটেনা। লিঙ্গানুপাতে ভারতে বৈষম্যের অবকাশ বরাবরই আছে কিন্তু বর্তমানে গভীর উদ্বেগজনক কথা এই যে, নারীর সংখ্যা ক্রমাগতই হ্রাস পাচ্ছে। এই সংখ্যার নিম্নগতি নীচের সারণি থেকে স্পষ্ট হবে।

সারণি (প্রতি এক হাজার পুরুষে)

বৎসর	ভারত	পশ্চিমবঙ্গ
১৯০১	৯৭২	৯৪৫
১৯১১	৯৬৪	৯২৫
১৯২১	৯৫৫	৯০৫
১৯৩১	৯৫০	৮৯০
১৯৪১	৯৪৫	৮৫২
১৯৫১	৯৪৬	৮৬৫
১৯৬১	৯৪১	৮৭৮
১৯৭১	৯৩০	৮৯১
১৯৮১	৯৩৪	৯১১
১৯৯১	৯২১	৯১৭

অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যে, যথা, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা, বিহারে এই লিঙ্গানুপাতের বৈষম্য আরও তীব্র। তবে কেরল রাজ্য এর ব্যতিক্রম, সেখানে পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যা বেশী। লিঙ্গানুপাতের এই বৈষম্য কিছুটা মনুষ্যসৃষ্টও বটে।

বর্তমানে গর্ভস্থ ভ্রূণের লিঙ্গ পরীক্ষার এবং তার শারীরিক কোন খুঁত বা রোগ আছে কিনা এই পরীক্ষা করার একটি বিশেষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি "Amneocentesis" ডাক্তারি মহলে চালু আছে। এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটি চালু করার ব্যবস্থা হয়েছিল যাতে রোগযুক্ত বিকলাঙ্গ সন্তান না জন্মায়। কিন্তু এই পদ্ধতির সুযোগ নিয়ে হাজার হাজার কন্যাভ্রূণ হত্যা করা হচ্ছে এবং হয়েছে। গুজরাট রাজ্যে ১৯৯০ সালে লক্ষধিক কন্যা ভ্রূণ হত্যা হয়েছে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং প্রযুক্তির অগ্রগতির সূচক হিসেবে গণ্য করা হলেও উপরোক্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটি কিন্তু কন্যাভ্রূণ হত্যার কাজেই ব্যবহৃত হচ্ছে এবং বিষম লিঙ্গানুপাতের পথ প্রশস্ত করছে। সমাজে নারীর অবস্থান বিষয়ে এই বিসম লিঙ্গানুপাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

অনুশীলনী ২

১। ভারতে নারীশিক্ষা সম্বন্ধে কিভাবে ধারণা এবং মত পরিবর্তিত হয়েছে। সাত লাইনে উত্তর দিন।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

২। ভারতে নারীশিক্ষার হার কী? গ্রাম ও শহরাঞ্চলে নারীশিক্ষার হাত কত? পাঁচ লাইনে লিখুন।

.....

.....

.....

.....

.....

৩। শুদ্ধ উত্তরটিতে (✓) এই চিহ্ন দিন

(ক) পিতৃতান্ত্রিক সমাজ-কাঠামো শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা সত্তেও নারীর নির্ভরশীলতা বজায় রেখেছে,

হ্যাঁ ☐ না ☐

(খ) চিরাচরিত গ্রামীণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উৎপাদন ও বেচাকেনার ক্ষেত্রে নারীর বিশেষ কোন ভূমিকা থাকা উচিত নয়,

হ্যাঁ ☐ না ☐

(গ) বর্তমান সময়ে পরিবারের অর্থনৈতিক মর্যাদাবৃদ্ধির অজুহাতে মেয়েদের চাকরি থেকে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে,

হ্যাঁ ☐ না ☐

(ঘ) শিল্পে নারীদের চাহিদা আছে কারণ তাদের কম মজুরীতে নিয়োগ করা যায়, তাদের সহজে প্রতারিত করা যায় এবং তারা ইউনিয়ন করেনা,

হ্যাঁ ☐ না ☐

২৯.৭ মর্যাদার ক্ষেত্রে ভারতীয় নারীর পরিবর্তিত অবস্থান

ছাত্র/ছাত্রীবন্দু, এতক্ষণ আমরা শিক্ষা, কর্ম ও সামাজিক ক্ষেত্রে নারীর অবস্থান বিষয়ে আলোচনা করেছি। মিশ্র অর্থনীতির ভিত্তিতে এবং রাষ্ট্রীয় যোজনা কমিশনের মাধ্যমে দেশের শিল্পায়ন ও প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। বিগত কয়েক বছর ধরে একথা মনে করা হয়েছিল যে, ঐ পরিকল্পিত প্রবৃদ্ধি উৎপাদনশীল বিনিয়োগের পরিমাণ অনেকগুণ বাড়িয়ে দেবে এবং জাতীয় আয়ও বৃদ্ধি পাবে। আরো মনে করা হয়েছিল যে, কোন একটি বিভাগ অথবা শ্রেণী অথবা লিঙ্গের সমৃদ্ধি ক্রমশ অন্যান্য খাতেও ছড়িয়ে পড়বে। কিন্তু এই ভাবনা নির্ভুল ছিল না। পক্ষান্তরে, আজ একথা স্বীকৃত হয়েছে যে অর্থনৈতিক উন্নতি ও প্রবৃদ্ধি দেশের আর্থসামাজিক বৈষম্যকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। প্রযুক্তির অগ্রগতি নারীদের পক্ষে কোন কাজে আসেনি। কারণ দেশের অর্থনীতি, আধুনিকীকরণের সুত্রে, গ্রাসাচ্ছদন ব্যবস্থা থেকে অর্থভিত্তিক ব্যবস্থায় পৌঁছেছে এবং বাজারকেন্দ্রিক হয়েছে। এ অবস্থায় সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে নারীরই। আগাছা নির্মূল করার বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা নেওয়ায় রাজস্থানের নারীকর্মীদের এক উল্লেখযোগ্য সংখ্যা তাদের চাকরি খুইয়েছে। অনুরূপভাবে, চালকলে নিযুক্ত নারীকর্মীদের একাংশ ধানভানার যন্ত্র বসাবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের চাকরি হারিয়েছে। এরা এই যন্ত্র বসাবার আগে হাতে ধানভানত। আবার হিমায়ণের সুবিধাযুক্ত নৌকা চালু হতে নারী মৎস্যকর্মীরা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছে। তাদের ঠেলে পাঠান হয়েছে নিবিড় শ্রমদান শিবিরে এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রে।

বিগত তিন চার দশকে আরেকটি ভুল ধারণার অবসান ঘটেছে। সেটি হ'ল পরিবারই একমাত্র সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠান। পরিবার প্রধানকে মদত দিলে পরিবারের অন্যান্য সদস্যেরাও লাভবান হবে, এ ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। দারদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী অথবা প্রান্তিক চাষীদের সাহায্যের জন্য যেসব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তাতে দেখা গেছে যে, সহায়ক অর্থ পুরুষদের কাছেই পৌঁছয়, নারীরা ও শিশুরা কদাচিৎ তার ভাগ পায়। সমীক্ষা করে আরো দেখা গেছে যে, পুরুষেরা আয় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভোগ্যপণ্য ও বিলাস দ্রব্যের পিছনে খরচ করে। সেক্ষেত্রে নারী ব্যয় করে তাদের পরিবারের জন্য। ১৯৭৮-৮৩-র খসড়া পরিকল্পনায় সকলের জন্য চাকুরির ব্যবস্থা, দারিদ্র্যদূরীকরণ এবং সমবন্টনের সমাজ গঠনই লক্ষ্য ছিল কিন্তু তা পূরণ হয়নি। আগেই দেখেছি যে নারীর কর্মনিযুক্তি কমেছে। সাক্ষরতার ক্ষেত্রে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়নি, পণজনিত কারণে বধূহত্যা বেড়েছে এবং কন্যাশিশুর অবমূল্যায়ন ঘটেছে অত্যন্ত করুণভাবে। এতেই প্রমাণ হয় যে কী ধরনের উন্নতির পথে চলেছি আমরা!

তবে একথাও মনে রাখতে হবে যে, গত দশ থেকে পনের বছরের মধ্যে এসব কু-প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে নারীর অবস্থান ও মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ষষ্ঠ যোজনা পর্যন্ত মহিলাদের জন্য বরাদ্দ ছিল কিছু কিছু কল্যাণমূলক ব্যবস্থা। ষষ্ঠ যোজনা দলিলেই প্রথম নারী ও উন্নয়নের উপর একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় লেখা হয়। এতে নারীদের জন্য অর্থনৈতিক কর্মসূচীর উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। মহিলাদের গ্রামোন্নয়নের অংশীদারত্ব কতখানি হচ্ছে তার স্বতন্ত্র হিসেব রাখার নির্দেশও দেওয়া হয়। এরই ভিত্তিতে ১৯৮২ সালে যখন দেখা গেল যে, IRDP-র সুযোগের শতকার একভাগও মহিলাদের কাছে পৌঁছচ্ছেনা তখন IRDP সুবিধাভোগীদের মধ্যে মহিলাদের অনুপাত শতকরা ১০ ভাগ হবে এই লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে মহিলা প্রাপকদের সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে গোষ্ঠীবদ্ধ করে ঋণদানের জন্য "গ্রামীণ" নারী ও শিশু উন্নয়ন প্রকল্প অথবা (DWCRA) নামে সহায়ক প্রকল্পও চালু করা হয়।

সপ্তম যোজনাকালে (১৯৮৫-৯০) এবং অষ্টম যোজনা কালে (১৯৯২-৯৭) এই একই প্রকল্পগুচ্ছের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। IRDP-র মহিলা প্রাপক লক্ষ্যমাত্রা বাড়িয়ে ১৯৮৫ সালে করা হয় ৩০ ভাগ এবং ১৯৯০ সালে শতকরা ৪০ ভাগ। অন্যদিকে ১৯৮৯-৯০ অর্থবর্ষে জওহর রোজগার যোজনা (JRY) চালু করে মোট কর্মসংস্থানের

শতকরা ৩০ ভাগ লক্ষ্যমাত্রা মহিলাদের জন্য বেঁধে দেওয়া হয়। এছাড়া, সপ্তম যোজনায় অনেক রাজ্যেই নারী উন্নয়ন নিগম (Woman Develppment Undertaiking) গড়ে উঠেছে, পশ্চিমবঙ্গেও উঠেছে। এর মাধ্যমে সমস্ত উন্নয়ন-কর্মসূচীর কিছুটা সমন্বয়সাধন করা যাবে। অষ্টম যোজনায় "ইন্দিরামহিলা যোজনা" চালু করা হয়েছে। এটির মাধ্যমে সকল নারী-কেন্দ্রিক কর্মসূচির সমন্বয়সাধন করা যাবে এবং সমস্ত নারী কর্মীকে একত্র করে কাজে লাগান যাবে।
এবার আমরা সংক্ষেপে নারীদের সম্পর্কে বিচার বিভাগে মনোভাব এবং আইনের ক্ষেত্রে পরিবর্তন নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

২৯.৭.১ আইনগত পদক্ষেপসমূহ

সামাজিক পরিবর্তনের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হ'ল দেশের আইনব্যবস্থা। ভারতীয় সংবিধানে আনুষ্ঠানিকভাবে নারীদের সমতা স্বীকৃত হয়েছে একথা আগেই আলোচনা করেছি। গত ১০ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে কয়েকটি আইন প্রণয়ন করা হয়েছে যেগুলি নারীর স্বার্থরক্ষার ক্ষেত্রে কার্যকর হয়েছে। এছাড়া এই দশকে ঘোষিত কয়েকটি বিচার বিভাগীয় রায় নারীর সমানধিকারের বিষয়টিকে আরো গুরুত্ব দিয়েছে।
কর্মক্ষেত্রে নারীর আধিকার সুরক্ষিত করতে পাশ হয়েছে Maternity Benefit Act. 1961, Minimum Wages Act এবং Equal Remuneration Act 1976। ১৯৭৮ সালে স্ত্রীর উপর স্বামীর দাম্পত্য অধিকার পুনঃস্থাপন বিরোধক আইন পাশ করে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নেয় সরকার। ১৯৮৩ সালে ফৌজদারী আইন সংশোধন ধর্ষণের সংজ্ঞায় মহিলাদের অনুকূলে যায় এমন কিছু নতুন মাত্রা সংযোজন করে। শাহবানু মামলায় বিচার বিভাগ একটি যুগান্তকারী রায় দিয়েছিল কিন্তু সেটিকে নানাবিধ কারণে বাস্তবে রূপান্তরিত করা যায়নি। এছাড়াও সংবিধানে ৭২ এবং ৭৩ তম সংশোধনীতে মহিলাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয়েছে। নারীর সমতার স্বীকৃতিতে ও মর্যাদা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত আইনগুলি প্রণয়ন হয়েছে যথা —

(ক) বিজ্ঞাপনে মহিলাদের অশ্লীল চিত্র প্রদর্শক বিরোধী আইন ১৯৮৬।
(খ) সতীপ্রথা নিবারণ আইন ১৯৮৭।
(গ) মহিলাদের আইনী সাহায্য দান সংক্রান্ত আইন ১৯৮৭।
(ঘ) পারিবারিক আদালত আইন ১৯৮৪।
(ঙ) স্বাস্থ্যের কারণে গর্ভাপাত আইন (Medical Termination of Pregnancy) ১৯৭১।
(চ) পণবিরোধী আইন ১৯৬১-এর সংশোধনী ১৯৮৪, ১৯৮৬।
(ছ) মহিলা সমৃদ্ধি যোজনা ১৯৯৩/রাষ্ট্রীয় মহিলা কোষ ১৯৯৩।

বিচার বিভাগীয় রায় এবং উপরোক্ত আইনের মাধ্যমে নারীর অবস্থান কিছুটা সুরক্ষিত হয়েছে অথবা তারা ন্যায়বিচার পাবার ক্ষেত্রে সদর্থক বা ইতিবাচক কিছু সুযোগ পেয়েছে।

২৯.৭.২ সরকারী ব্যবস্থা

সরকার বিগত দশ থেকে পনের বছরের মধ্যে মহিলাদের অবস্থার উন্নতিকল্পে কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এসবের মাধ্যমে মহিলাদের জন্য কিছু কল্যাণমূলক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং তাদের অর্থনৈতিক উন্নতির লক্ষ্যে কয়েকটি কার্যকরী পদক্ষেপও গৃহীত হয়েছে।
১৯৭৬ সালে শ্রম সম্পর্কিত একটি মহিলা বিভাগ মন্ত্রীসভায় গঠিত হয়েছিল। সেই সময় থেকে এই বিভাগ কাজ করে আসছে নারী শ্রমিকদের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে। ১৯৭৮ সালে প্রথম মহিলাদের নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে যোজনা কমিশন কর্তৃক একটি কার্যকরী দল সংগঠিত হয়েছিল যেটি মহিলাদের অবস্থা সম্পর্কে সমীক্ষা চালিয়ে এবং ষষ্ঠ পরিকল্পনায় মহিলাদের নিয়োগ সংক্রান্ত সম্ভাবনামূলক তথ্য জুগিয়েছিল। এর ফলে একটি নীতি গৃহিত হয়েছিল যে,

মহিলাদের এখন থেকে কল্যাণমূলক পরিকল্পনার লক্ষ্যবস্তু হিসেবে না দেখে তাদের উন্নতিবিধানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে। মহিলাদের উন্নতিবিধানের জন্য ষষ্ঠ পরিকল্পনায় একটি অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ব পরিকল্পনার ওপর ভিত্তি করে একটি কার্যকরী জাতীয় পরিকল্পনাও তৈরী করা হয়েছিল মহিলাদের জন্য। এর ফলে মহিলাদের কল্যাণসাধন এবং উন্নতিসাধনের জন্য মন্ত্রিসভার সমাজকল্যাণ দপ্তরে একটি সংস্থা তৈরী করা হয়েছিল যার কাজ ছিল মহিলাদের উন্নতির জন্য নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা। সর্বশেষ, একজন বিশিষ্ট মন্ত্রীকেও নিয়োগ করা হয়েছে মহিলাদের স্বার্থ-রক্ষার দিকগুলি দেখার জন্য।

কতকগুলি নীতি নির্ধারণের পদক্ষেপ ছাড়াও সরকার কর্তৃক গৃহীত কয়েকটি কার্যপদ্ধতিরেও উল্লেখ করা প্রয়োজন। নিয়োগ সুনিশ্চত করার পরিকল্পনা, তপশিলী জাতি ও উপজাতির মহিলাদের সামাজিক সাহায্যদানের জন্য প্রস্তুত নিবিড় গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা, পারিবারিক আদালত স্থাপন, পুলিশ বিভাগে মহিলা সেল এবং সাম্প্রতিককালে গঠিত নারী কমিশন, যেখানে দরিদ্র বিভাগে স্ব-ক্ষেত্রে নিযুক্ত মহিলাদের সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং সমসাগুলির তীব্রতা কমানর জন্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় — এগুলি হ'ল কয়েকটি উদাহরণ যেগুলিকে মহিলাদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য কিছু সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে সরকারী কর্মতৎপরতা হিসেবে পরিগণিত করা হয়ে থাকে। বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিভাগও কয়েকটি পরিকল্পনাকে উৎসাহিত করেছে যার মাধ্যমে নারীর একঘেয়ে জীবনকে কিছুটা ক্লান্তিমুক্ত করা যাবে প্রযুক্তির ব্যবহার গ্রহণ করে এবং তাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক চেতনার বৃদ্ধি ঘটিয়ে।

অবশ্য এই সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণস্বত্ত্বও যদি সংবেদনশীল আমলা অথবা কর্মীদের দলগুলির মাধ্যমে বাস্তব প্রচেষ্টা গ্রহণ করা না হয় তাহলে পরিকল্পনাগুলির গল্পকথা হবে যে এগুলিতে মহিলাদের সমস্যার প্রতি কোনও প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে না।

২৯.৮ নারী সংগঠন ও নারী আন্দোলন

গত দশকের একটি অত্যন্ত লক্ষণীয় ঘটনা হ'ল অক্ষমতা দূরীকরণের জন্য নারীদের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসা কিছু গোষ্ঠীর চাপ, লিঙ্গ বিচারের দাবীর স্থায়িত্ব এবং নারীরা যে সব বিষয়ের সম্মুখীন হন সেগুলির প্রতি সমাজের বৃহত্তর অংশের মহিলাদের মনোযোগ আকর্ষণ।

স্বাধীনতা লাভের পরবর্তীকালে যে শান্তি বিরাজমান ছিল তা শেষ হয়ে গিয়েছে মনে করা যেতে পারে। নারী গোষ্ঠীগুলি প্রতিনিয়তই কোন না কোন মহিলা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন এবং তাঁরা ঐগুলি নিয়ে হয় প্রচারাভিযান করছেন অথবা ক্ষোভ প্রদর্শন করছেন। এটি হয়ত মঞ্জুশ্রী হত্যার কেস নিয়ে হতে পারে অথবা ভ্রূণ পরীক্ষার বিষয়ে প্রবল বাধা হতে পারে অথবা কোন সুপরিচিত নারী পত্রিকার সৌজন্যে পরিচালিত 'মিস ইন্ডিয়া' প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে হতে পারে অথবা লিঙ্গের প্রতীক হিসেবে গণমাধ্যমে প্রকাশের জন্য মহিলাদের ব্যবহারের বিরুদ্ধে হতে পারে, শতাধিক নারীর খরাক্লিষ্ট অত্যন্ত সাংঘাতিক অবস্থার প্রতি জনসাধরণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য হতে পারে অথবা উপজাতিভুক্ত নারীদের জমির অধিকার স্থায়ীকরণের জন্যও এই ধরনের নারী ক্ষোভপ্রদর্শন হতে পারে। এই গোষ্ঠীগুলির মধ্যে অনেকগুলিই এই অর্থে স্বয়ংশাসিত যে তারা কোন রাজনৈতিক দলের ওপর নির্ভরশীল নয় যদিও স্বতন্ত্রভাবে কোন সদস্যার কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংযুক্তি থাকতেও পারে। কলেজীয় শিক্ষায় শিক্ষিত শহরুরে মেয়েরা এই ধরনের সদস্যপদ নিয়ে থাকেন, তাঁরা কোন একনায়কত্বের অবস্থানে বিশ্বাস করেন না এবং কোন একটি সংগঠনের গোঁড়া কাঠামোরও বিরোধীতা করেন। তাঁদের উদ্দেশ্য প্রচারের জন্য তাঁদের নিজস্ব পত্রপত্রিকা আছে, মহিলাদের প্রশ্নের জবাবও আছে। আপনি নিশ্চয়ই এমন সমস্ত গোষ্ঠীর মহিলাদের নাম শুনেছেন, যেমন, ''সহেলী'', ''মৈত্রিণী'', ''সহিয়ার'' আওয়াজ, নিপীড়নের বিরুদ্ধে মহিলাদের মতামত প্রকাশের মঞ্চ ইত্যাদি।

২৯.৮.১ প্রতিষ্ঠিত সংস্থাগুলির পুনরুজ্জীবন

বিগত পাঁচ বছর ধরে যে একটি অত্যন্ত উৎসাহজনক কর্মধারা লক্ষ্য করা গিয়েছে তা হ'ল অল ইডিয়া উইমেনস্ কনফারেন্স, ইয়ং উইমনেস্ খ্রীষ্টান এ্যাসোসিয়েশন, ন্যাশানাল ফেডারেশন অফ্ ইউনির্ভাসিটি উইমেন ইত্যাদি এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠত মহিলাদের প্রতিষ্ঠানগুলির পুনরুজ্জীবন, যে প্রতিষ্ঠানগুলি অনেক বেশী জড়িত ছিল উচ্চজাতির শিক্ষিত নারীর সমস্যা নিয়ে। ঠিক ঐ সময় নারী ধীরে ধীরে তার বহিরাবরণ ছেড়ে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে এবং জ্বলন্ত সমস্যাগুলি নিয়ে সভাসমিতি ও আলোচনাসভা গড়ে তুলেছে অথবা প্রতিবাদমূলক কাজের মধ্য দিয়ে অন্যান্য শক্তিগুলির সাথে মিলিত হচ্ছিল অথবা তৃণমূল স্তরে কাজ করেছে। সেদিন আর নেই যখন শুধুমাত্র মেয়েদের সমস্যাগুলির কথা উল্লেখ করেই অথবা ''ফেমিনিস্ট'' শব্দটি উচ্চারণ করেই এমন সাড়া জানান যেত যে, যৌথ পরিবারে ভারতীয় নারীর একটি সুদৃঢ় ভিত্তি আছে এবং তাঁদের চারিদিকে তাঁদের প্রশংসা করার মত লোক আছেন, যার ফলে তাঁদের নারীদের জন্য আন্দোলন করার প্রয়োজন নেই। একইভাবে তৃণমূল স্তরেও মানুষের কাছে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা পৌঁছে দিতে এবং মানুষের সুস্বাস্থ্য এবং আবাসনের বন্দোবস্ত করতে কতকগুলি প্রতিষ্ঠান কাজ করে যাচ্ছে। ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠান সমূহ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলিও আজকের সমাজে নারীর বিশেষ সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে শুরু করেছে।

অনুশীলনী ৩

১। কিভাবে নারীকে পরিবারকে সাহায্য দেবার লক্ষ্যবস্তু হিসাবে ভুল ধারণা করা হয়ে থাকে ব্যাখ্যা করুন। সাতটি লাইন ব্যবহার করুন।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

২। ১৯৭৬ সালের সমান মজুরী আইন ব্যাখ্যা করুন। তিনটি লাইন ব্যবহার করুন।

.....

.....

.....

৩। নারী কল্যাণের জন্য সরকারী নীতিগুলির ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন আনা হয়েছে সেগুলি আলোচনা করুন। পাঁচটি লাইন ব্যবহার করুন।

.....

.....

.....

.....

২৯.৮.২ নারী সম্পর্কে পাঠক্রম ঃ গবেষণার বিষয়

নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে যত কাজ হচ্ছে সেগুলির সাথে এবং নারীগোষ্ঠীর মধ্যে যত কাজ হচ্ছে তার সাথে আমাদের সেইসব পরিবর্তনের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে যে পরিবর্তনগুলি নারী শিক্ষাবিদ্‌দের মধ্যে কেউ কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদান পদ্ধতির মধ্যে নিয়ে আসছেন। গবেষণা এবং শিক্ষাদানের বিষয় হিসেবে নারী সংক্রান্ত পাঠক্রম বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন দ্বারা স্বীকৃতি লাভ করেছে। নারী বিষয়ক পাঠক্রম সংক্রান্ত বিভাগ ও পরিকল্পনাগুলি গবেষণার মাধ্যমে নারীর সমস্যাকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে দেখিয়েছে এবং সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন-সাধন ও তাকে বজায় রাখার জন্য নারীর অবদানের কথাও তুলে ধরেছে। ১৯৮১ সালে ভারতবর্ষে এ্যাসোসিয়েশন অব উইমেনস্ নামে একটি সংস্থা গঠিত হয়েছিল যেটি এর বাৎসরিক সভা, আলোচনা সভা এবং অন্যান্য সমর্থনমূলক কাজ মহিলাদের শিক্ষাদান সংক্রান্ত পাঠক্রমকে সরকারী এবং বে-সরকারী শিক্ষাদান পরিকল্পনা এই উভয় ক্ষেত্রেই উৎসাহিত করবে। অনেক গবেষক মহিলাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে নারীর অবস্থান সম্পর্কিত বিষয়গুলি বিশ্লেষণ করছেন।

অবশ্য, একটি অতি লক্ষণীয় উন্নতি দেখা যাচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে। মহিলাদের শাখা সৃষ্টির মাধ্যমে বক্তব্য রাখার বিভাগ তৈরী হচ্ছে। এটি বিশেষ করে দেখা যাচ্ছে বামপন্থী দলগুলির মধ্যে। এমন একটি সময় ছিল যখন বামপন্থী দলগুলি মনে করতেন যে খেটে-খাওয়া শ্রেণীর মানুষের রাজনৈতিক সংগ্রাম ও সমস্যাগুলিকে প্রাধান্য দিয়ে আলোচনা করা উচিত। মহিলাদের সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ঘটানর পরেই তাদের বিভিন্ন প্রশ্নগুলির সমাধান করতে হবে। বর্তমানে মহিলাদের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা বিবেচনা করে রাজনৈতিক দলগুলিকে অধিকসংখ্যক মহিলা ও পার্টিসদস্যাদের বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে হবে।

এইভাবে শুধুমাত্র নারী সংগঠনের মধ্যেই নয় নারীদের সমস্যাগুলি তাৎপর্য লাভ করছে সেই সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্যেও যাঁরা সাধারণ মানুষের জন্য আন্দোলন করছেন। এক কথায় বলতে গেলে, এই সমস্যাগুলি মানুষের চিন্তার জগতে আলোড়ন এনেছে।

২৯.৯ সারাংশ

এই বিভাগে আমরা ভারতে নারীর প্রকৃত অবস্থান এবং সমস্যাগুলি বুঝতে চেষ্টা করেছি; যে প্রচেষ্টা চলাকালীন আমরা নারীদের সম্পর্কে কিছু রূপকথা তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। এই রূপকথাগুলি নারীকে হয়ত বেদীর ওপর বসিয়েছে আবার কখনও দুর্বল হিসেবে চিত্রিত করেছে। এই উন্নতির পদ্ধতি নারীকে ক্ষতিকরভাবে প্রভাবিত করেছে। শিক্ষাব্যবস্থা এখনও বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় নারীর কোন জায়গা থাকছে না দক্ষতা অর্জনের জন্য—যে দক্ষতা তাদের বিভিন্নক্ষেত্রে দক্ষতা ভিত্তিক কাজে প্রবেশ সম্ভব করবে।

নারীর মর্যাদা এবং সমস্যাগুলির যে চিত্র দেওয়া হয় তার উদ্দেশ্য হ'ল একটি বার্তা পৌঁছে দেওয়া যে, ভারতীয় মহিলাদের অবস্থানে কোন পরিবর্তন হয়নি। বস্তুত, আমরা যে বিষয়টি সবার নজরে আনতে চাই তাহ'ল কিছু বৃহৎ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তিগুলি এবং একই সাথে আদর্শগত অতিরিক্ত বিষয়গুলি নারীর অবস্থানকে

প্রতিকূলভাবে প্রভাবিত করেছে। পরিবর্তনের আরও কিছু আশাপ্রদ লক্ষণ হ'ল নারীর প্রকৃত অবস্থা এবং সেই অবস্থার প্রতিকারের জন্য তাদের সক্রিয় মধ্যস্থতা বিষয়ে নীতি-নির্দ্ধারকদের দ্বারা স্বীকৃতি দান। গত ত্রিশ থেকে চল্লিশ বছর ধরে যে উন্নতি সেটি নির্দেশ করে যে, লিঙ্গ বিষয়ে সমতা কখনই সংবিধানের মাধ্যমে স্থায়ী হবে না। এটি আলোচিত কাজের মাধ্যমে বাস্তবায়িত করতে হবে।

২৯.১০ গ্রন্থপঞ্জী

Neera Desai and Maithreyi Krishna Raj (Eds) : Women and Society in India, Ajanta Publication, 1987

Amit Kumar Gupta : Women and Society. The Developmental Perspective, Criterion Publications, 1986

Neera Desai and Vibhuti Patel : Change and Challenge in the International Decade, 1975-85 Popular Prakashan, 1985

Kamala, Bhasin and Bina Agarwal : Women and Media, Analysis, Alternatives and Action. Kali for Women, New Delhi, 1985

Joanna Liddle and Rama Joshi : Daughters of Independence, Gender Caste and Class in India, Kali for Women, 1986

২৯.১১ উত্তরমালা

অনুশীলনী ১

১। নারীর মর্যাদা সম্পর্কে রূপকথাগুলি এইরকম যে তাঁকে শক্তির দেবীর সমান মর্যাদা দেওয়া হয় অথবা শক্তির নীতির সমান মনে করা হয়। ভারতীয় সমাজে মাতৃমূর্তি শ্রদ্ধার পাত্র। যাই হোক, প্রকৃতপক্ষে তাকে মনে করা হয় নম্র ও দুর্বল হিসেবে, যাকে রক্ষা করবেন পরিবারের পিতা, স্বামী ও পুত্র। তাঁকে স্বাধীনতা দেওয়া হয় না এবং একজন দক্ষকর্মী ও উৎপাদক হিসেবে তাঁর অবদানকে মূল্য দেওয়া হয় না।

২। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে সমস্ত সমাজ সংস্কারকগণ ভারতবর্ষের মহিলাদের অসম মর্যাদার প্রশ্নটি তুলেছিলেন তাঁরা হলেন রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, এম. জি. রাণাডে, মহর্ষি কার্ভে, জ্যোতিবা ফুলে, দয়ানন্দ সরস্বতী এবং অন্যান্য কয়েকজন।

৩। ভারতবর্ষের নারীর মর্যাদা সম্পর্কে আশা এবং আত্মতুষ্টি আধুনিককালে চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছে যখন ষ্ট্যাটাস কমিটি নারীর মর্যাদা সম্পর্কে রিপোর্ট পেশ করেছেন ১৯৭৪ সালে। এই বিষয়ে ও অন্যান্য বিষয়ে সমীক্ষা দীর্ঘ প্রতিবেদন পেশ করেছে যেখানে দেখান হয়েছে মহিলাদের প্রতি নিপীড়ন আমাদের সমাজে কোন্ পর্যায়ে পৌঁছেছে।

অনুশীলনী ২

১। ভারতবর্ষের নারীশিক্ষা সম্পর্কে মতের পার্থক্য দেখা দিয়েছে। আগে এমন বিশ্বাস করা হ'ত যে তার কাজের পরিধি ছিল বাড়ী এবং সেইজন্য গৃহস্থালী এবং এই সম্পর্কিত কাজ ছাড়া অন্য কোন কাজ তার শেখার প্রয়োজন নেই। কিন্তু গত একশ বছরের ক্রমবর্দ্ধমান অনুকূল হাওয়া নারী শিক্ষার সমর্থনে বইছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে নারীকে শিক্ষাক্ষেত্রে সাহায্য করার জন্য বেশ কিছু সামাজিক সংস্কার আনা হয়েছিল।

২। ১৯৮১ সালের আদসুমারীর হিসেব অনুযায়ী ভারতে নারী শিক্ষার হার শতকরা ২৪.৮ ভাগ। ভারতবর্ষের গ্রামাঞ্চলে এটি প্রায় শতকরা ১৮ ভাগ এবং শহরাঞ্চলে এটি বেশী, প্রায় শতকলা ৪৭.৮ ভাগ।

৩। (ক) হ্যাঁ (২৯.৪.৩ অনুচ্ছেদটি দেখুন)

(খ) না (২৯.৫ অনুচ্ছেদটি দেখুন)

(গ) হ্যাঁ (২৯.৫.১ অনুচ্ছেদটি দেখুন)

(ঘ) হ্যাঁ (২৯.৫.৩ অনুচ্ছেদটি দেখুন)

অনুশীলনী ৩

১। পরিবারকে সাহায্যের লক্ষ্যবস্তু হিসেবে মনে করা একটি ভুল ধারণা। পরিবারের প্রাধান্যকে সাহায্য করলে পরিবারের সবাইকে সাহায্য করা হয় এই বিশ্বাসটি ভুল প্রমাণিত হয়েছে। দারিদ্র্য সীমারেখার নীচে যাঁরা আছেন অথবা প্রান্তিক চাষীর শ্রেণীতে যারা আছেন তাঁদের সাহায্য করার জন্য যে পরিকল্পনাগুলি আছে সেগুলি মূলত পুরুষদের জন্য সাহায্যকারী পরিকল্পনা, নারী অথবা শিশুদের কাছে সেগুলি কদাচিৎ পৌঁছায়।

২। ১৯৭৬ সালের সমান মজুরী আইন নিয়োগকারীদের ওপর একই কাজের জন্য পুরুষ ও নারীকে সমান মজুরী দেবার দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছিল।

৩। সরকারী নীতিতে যে সব পরিবর্তন এসেছে সেই পরিবর্তনগুলি শুধু দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে। নারী কল্যাণকর পরিকল্পনাগুলিকে লক্ষ্যবস্তু হিসেবে দেখার বদলে তাদের একটি জটিল গোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে—যাদের উন্নতি বিধান প্রয়োজন। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মহিলাদের উন্নতির জন্য একটি অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে।

একক ৩০ শিক্ষা সমাজ-পরিবর্তনের মাধ্যম

গঠন

৩০.০ উদ্দেশ্য

৩০.১ প্রস্তাবনা

৩০.২ শিক্ষায় ঔপনিবেশিক অবদান

৩০.২.১ মেকলের সংক্ষিপ্ত বিধি, ১৮৩৫

৩০.২.২ উডের বিজ্ঞপ্তি, ১৮৫৪

৩০.২.৩ ভারতীয় শিক্ষা কমিশন, ১৮৮২

৩০.২.৪ সরকারী সিদ্ধান্ত, ১৯০৪

৩০.২.৫ জাতীয় শিক্ষা পরিষদ, ১৯০৬

৩০.২.৬ শিক্ষায় অনগ্রসরতার কারণ

৩০.৩ শিক্ষায় জাতীয় আন্দোলনের প্রভাব

৩০.৩.১ জাতীয় আন্দোলন ও শিক্ষা পদ্ধতি, ১৯২০-৩৭

৩০.৩.২ বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনা

৩০.৩.৩ সার্জেন্ট রিপোর্ট, ১৯৪৪

৩০.৪ স্বাধীন ভারতে শিক্ষা ব্যবস্থা

৩০.৪.১ স্কুলে ছাত্রভর্ত্তির হার

৩০৪.২ পশ্চাদ্‌গামী রাজ্যে শিক্ষা

৩০.৪.৩ উচ্চ-শিক্ষা

৩০.৪.৪ উচ্চ-শিক্ষা বিস্তারের স্তর

৪০.৪.৫ উচ্চ-শিক্ষার সমস্যা

৩০.৫ নতুন শিক্ষা-নীতির অভিমুখে

৩০.৫.১ পরিমাণগত বিস্তার

৩০.৫.২ ন্যায়পরায়ণতা

৩০.৫.৩ উৎকর্ষ ও উদ্ভাবনী শক্তি

৩০.৫.৪ জাতীয়, মানবিক ও বৈজ্ঞানিক মূল্যবোধ

৩০.৬ প্রযুক্তি, শিক্ষা ও সমাজ-পরিবর্তন

৩০.৭ সারাংশ

৩০.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৩০.৯ উত্তরমালা

৩০.০ উদ্দেশ্য

- এই এককের পাঠ শেষ হলে ঃ
- ভারতে শিক্ষার ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক পদ্ধতির ধারণা করা যাবে,
- শিক্ষার প্রতি জাতীয় আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গী ব্যাখ্যা করা যাবে,
- স্বাধীন ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করা যাবে,
- নয়া শিক্ষা-পদ্ধতি আলোচনা করা যাবে এবং
- ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন বর্ণনা করা যাবে।

৩০.১ প্রস্তাবনা

এই অংশে ভারতে ঔপনিবেশিক শিক্ষা পদ্ধতি নিয়ে শুরু করে ১৮৩৫-এর মেকলের সংক্ষিপ্ত বিধি, ১৯৫৪-এর উডের বিজ্ঞপ্তি, ১৮৮২-এর ভারতীয় শিক্ষা কমিশন, ১৯০৪-এর সরকারী সিদ্ধান্ত আর ১৯০৬-এর জাতীয় শিক্ষা পরিষদের আলোচনা করা হয়েছে। এই অংশে শিক্ষা ব্যবস্থায় জাতীয় আন্দোলনের ভূমিকা নিয়ে বিশেষ, আলোচনা করা হয়েছে। স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতে শিক্ষা ও সাক্ষরতার বিষয়টি এই অংশে আলোচনা করা হয়েছে। উচ্চতর শিক্ষা আর ১৯৮৬-এর নব শিক্ষা-পদ্ধতির মূল বিষয়গুলিও এখানে আলোচনা করা হয়েছে। সবশেষে এই অংশে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

৩০.২ শিক্ষায় ঔপনিবেশিক অবদান

ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে শিক্ষায় রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সূত্রপাত দেখা যায় ১৮১৩-এর সনদের বলে প্রণীত আইন প্রবর্তনের সময় থেকে যখন ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাধ্য হয় ভারতীয়দের শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করতে। সেই সময়ে শিক্ষার জন্য এক লক্ষ্য টাকা নির্দিষ্ট করে রাখা হয়। এইভাবে ভারতে ওপনিবেশিক শিক্ষার সূত্রপাত হয়। ১৮১৩ সালের সনদে কিছু অস্পষ্টতা থাকায় ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্মকর্তাদের মধ্যে বিশুদ্ধবাদী ও ইংরেজ ভাবাপন্নদের মধ্যে তখন কিছু বিরোধীতা দেখা যায়। এটা স্পষ্ট হয় যে, ব্রিটিশরা পশ্চিমী শিক্ষা ও ইংরেজী ভাষা মাধ্যম প্রবর্তন করতে চায়। অন্যদিকে বিশুদ্ধবাদীরা ইংরেজী ভাষা এবং বিজ্ঞান ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রাধান্য দেওয়ার বিরোধী ছিলেন।

৩০.২.১ মেকলের সংক্ষিপ্ত বিধি, ১৮৩৫

লর্ড টি.বি. মেকলে (Lorn T.B. Macaulay) গভর্ণর জেনারলের প্রশাসন পরিষদে আইন বিভাগের একজন সদস্য হিসেবে ভারতে আসেন। গভর্ণর জেনারেল উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক তাঁকে জনশিক্ষার জন্য গঠিত

সাধারণ সভার সভাপতি নিযুক্ত করেন। শিক্ষায় বিশুদ্ধবাদী ও ইংরেজী ভাষা-প্রধানদের তর্ক-বিতর্ক মেকলকে জানান হয়। এসবের ফল হিসেবে ১৮৩৫-এ মেকলের সংক্ষিপ্ত-বিধি প্রকাশিত হয়। মেকলে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পশ্চিমী শিক্ষা-ব্যবস্থার পক্ষে মতামত দেন। তিনি বলেন, "আমাদের সীমিত ক্ষমতায় সমস্ত মানুষকে শিক্ষিত করা সম্ভব নয়। আমরা এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালভাবে এমন একটা শ্রেণী তৈরী করতে পারি যারা আমাদের মধ্যে ও আমাদের শাসিত লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে ব্যাখ্যাকর্তার কাজ করতে পারবে; এই শ্রেণী রক্তে ও বর্ণে হবে ভারতীয় কিন্তু অভ্যাস, মতামতে, নীতি ও বুদ্ধিবৃত্তিতে হবে ইংরেজ।" তিনি বলেন, "এই বিশেষ শ্রেণীর উপর স্বদেশী ভাষার সংস্কারের দায়িত্ব অর্পণ করা যেতে পারে এবং পশ্চিমের শব্দভাণ্ডার থেকে বিজ্ঞানের শব্দ ব্যবহার করে নিজেদের ভাষার উন্নতি সাধন করে এই শ্রেণীই দেশের বিশাল জনসংখ্যার জন্য জ্ঞান বিস্তারের বাহনের কাজ করতে পারে।" আদর্শবাদী ও ইংরেজীপন্থীদের তর্ক-বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে মোটামুটিভাবে এগুলিই মেকলের বক্তব্য। ১৮৩৫-এর মার্চ মাসের এই সিদ্ধান্তই ভারতের শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকারের প্রথম ঘোষণা।

৩০.২.২ উডের বিজ্ঞপ্তি, ১৮৫৪

মেকলের দৃষ্টিভঙ্গীকে নিশ্চিত ও জোরদার করে ১৮৫৪-এর উডের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, "আমরা জোরের সঙ্গে ঘোষণা করতে পারি যে ভারতে যে শিক্ষা আমরা বিস্তার করতে চাই তার উদ্দেশ্য হবে ব্যাপক উন্নত কলাবিদ্যা, বিজ্ঞান, দর্শন ও ইউরোপীয় সাহিত্য; সংক্ষেপে ইউরোপীয় জ্ঞান।"

উডের ঘোষণার ফলে আইন করে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ধাঁচে কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮৬৯ সালে লাহোর বিশ্ববিদ্যালয় স্থান করা হয়। ১৮৭৭ সালেই প্রথম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মেয়েদের জন্য ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা চালু করে। এরপরে ১৮৮১-তে মাদ্রাজে ও ১৮৮৩-তে বোম্বাই-এ এই ব্যবস্থা অনুসরণ করা হয়।

৩০.২.৩ ভারতীয় শিক্ষা কমিশন, ১৮৮২

১৮৫৪-এর উডের বিজ্ঞপ্তির সিদ্ধান্তগুলি কার্যকর করতে, বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এর প্রয়োগে অসুবিধা হওয়ায় ১৮৮২-তে স্যার ইউলিয়াম হান্টারকে (বড়লাটের কার্যকরী পরিষদের সদস্য) সভাপতি ও অন্য আরও কুড়িজন সদস্য নিয়ে ভারতীয় শিক্ষা কমিশন নিযুক্ত হয়। কখনও কখনও একে হান্টার (Hunter) কমিশনও বলা হয়।

এই কমিশনের প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তগুলি হ'ল ঃ (১) স্বদেশী শিক্ষায় উৎসাহ দান, (২) প্রাধমিক শিক্ষার প্রয়োগ, বিস্তার ও উন্নতির জন্য ব্যাপক প্রচেষ্টা করা হবে, (৩) মাধ্যমিক শিক্ষারগ ক্ষেত্রে—যে সমস্ত জেলায় জনসাধারণের প্রয়োজন আছে কিন্তু সামর্থ নেই সেই সব জেলায় একটি উচ্চ আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন করা যেতে পারে এবং (৪) উচ্চ বিদ্যালয়ে ওপরের শ্রেণীগুলির দু'টি ভাগে ভাগ থাকবে ঃ একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য আর অন্যটি ব্যবহারিক জ্ঞানের জন্য।

৩০.২.৪ সরকারী সিদ্ধান্ত ১৯০৪

লর্ড কার্জনের (Lord Curzon) আমলে ১৯০৪ সালে এক সরকারী সিদ্ধান্তে প্রাথমিক শিক্ষার উপর বিশেষ, জোর দিয়ে বলা হয় যে, রাষ্ট্রের তরফে এটিই হবে প্রয়োজনীয় কাজ। শিক্ষা পদ্ধতির মান, আর্থিক স্থায়িত্ব, সঠিক পরিচালন সমিতি এবং মাধ্যমিক শিক্ষায় উচ্চ মানের ওপর এই সিদ্ধান্তে বিশেষ জোর দেওয়া হয়। ঐ

একই বৎসর ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন (১৯০৪) পাশ করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে শিক্ষাদান ও পরীক্ষা গ্রহণের অধিকার দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে শিক্ষক নিয়োগ, গ্রন্থাগার ও গবেষণাগারের উন্নতি ও শিক্ষকদের গবেষণায় উৎসাহদানের অধিকার দেওয়া হয়। পাঁচ বছরের জন্য সিনেটে সদস্যসংখ্যা নির্দিষ্ট করা হয়। সিনেটের সদস্যরা প্রত্যেকে কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে কুড়িজন সদস্য নির্বাচনের অধিকার পায়। সিণ্ডিকেটকে আইনী মর্যাদা দান করা হয় এবং সিনেট ও সিণ্ডিকেটে অধ্যাপকদের প্রয়োজনীয় প্রতিনিধিত্ব বাধ্যতামূলক করা হয়।

৩০.২.৫ জাতীয় শিক্ষা পরিষদ, ১৯০৬

শিক্ষাক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকারের পদ্ধতি ও পরিকল্পনায় অসন্তুষ্ট ও ভারতীয় নেতৃবৃন্দ ১৯০৬ সালে বাংলায় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ রেজিষ্ট্রি করেন। ভারতীয়দের নিজের হতে শিক্ষাব্যবস্থা গ্রহণের এটিই প্রথম নজির।

জাতীয় শিক্ষা পরিষদের উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনা করা অর্থাৎ ঃ (ক) ভারতীয় ভাষার সাহায্যে শিক্ষাদান; (খ) ভারতীয় ভাষায় ভাষায় প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন; (গ) শারীরিক ও নৈতিক শিক্ষা; (ঘ) দেশ সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানেরউপর জোর দেওয়া; (ঙ) ভারতীয় জ্ঞানসহ বৈজ্ঞানিক, পেশাগত ও প্রযুক্তিগত শিক্ষাদান এবং (চ) শৃঙ্খলা ও পারদর্শিতা।

দাদাভাই নওরোজী ১৮৮২-এর ১৬ই সেপ্টেম্বরে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সমর্থন জানিয়ে ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের কাছে একটি বিজ্ঞপ্তি পেশ করেন কিন্তু আমরা সবাই জানি যে এটি গৃহীত হয়নি। যদিও ১৮৩৩ সালে ব্রিটেনে পার্লামেণ্ট শিক্ষাখাতে বিশ হাজার পাউণ্ড অনুদান দেয় আর ১৮৮২-তে ব্রিটেনে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা আইন প্রচলন করলে ব্রিটিশ জনসংখ্যার প্রতি সাতজনে একজন বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী হয়। কিন্তু ১৮৮২ সালে নওরোজী যখন সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার জন্য আবেদন জানান তখন ভারতে জনসংখ্যায় ১১৪ জনে ১ জন মাত্র শিক্ষার্থী। ঔপনিবেশিক শিক্ষার চিত্রটি এখানে স্পষ্ট দেখা যায়।

১৯০৬ সালে বরোদার গাইকোয়াড বরোদা রাজ্যের সর্বত্র বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করেন। এই ঘটনায় উৎসাহিত হয়ে ১৯১০ সালে গোখলে আইন পরিষদে এক প্রস্তাব আনেন এবং ১৯১১ সালে ব্রিটিশ রাজকীয় আইন পরিষদের কাছে আঞ্চলিক সংস্থাগুলির মাধ্যমে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার জন্য আইনের একটি খসড়া উত্থাপন করেন। কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত তুলে নিতে হয় ও পরিষদে আইনের প্রস্তাবটি পরাস্ত হয়।

৩০.২.৬ শিক্ষায় অনগ্রসরতার কারণ

ব্রিটিশ শাসনের গোড়ার দিকে বিশেষ করে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে শিক্ষার অনগ্রসরতার কারণ হিসাবে একটি পদ্ধতিকে দেখান যায় যে পদ্ধতি ''নিম্নাভিমুখী পরিশোধন তত্ত্ব'' (''down ward filtration theory'') নামে পরিচিত। ১৭৮০ থেকে ১৮৩৩ সালের মধ্যে এই এই তত্ত্ব বিকশিত হয় ও ১৮৫৪ সালে ''উডের বিজ্ঞপ্তি'' পর্যন্ত চালু থাকে। উডের বিজ্ঞপ্তিতে ভারতে ইংলণ্ডের অভিজাত শ্রেণীর অনুরূপ একটি শাসক শ্রেণী সৃষ্টির পূর্বতন নীতির পরিবর্তন করা হয়। সেই সময়ে প্রশাসনিক দ্বিতীয় ভ্রান্তি ছিল ইংরেজীর মাধ্যমে উচ্চ-শিক্ষা প্রদান। মাধ্যমিক শ্রেণী, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজীই ছিল মাধ্যম এবং ভারতে একটি শাসক গোষ্ঠী তৈরী করার জন্য এর ওপরেই জোর দেওয়া হত। ব্যক্তিগত উদ্যোগে ইংরেজী-মাধ্যম মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজ স্থাপনের প্রচেষ্টাকে বিশেষ উৎসাহ দেওয়া হত।

১৮৫৪-তে উডের বিজ্ঞপ্তিতে, ১৮৮২-এর ভারতীয় শিক্ষা কমিশন ও ১৯০৪ সালে লর্ড কার্জনের সময় সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি অবহেলার কথা বলা হয়। মুন্‌রো (Munro) ও এ্যাডাম (Adam) নির্দিষ্ট করে দেখান যে, দেশীয় শিক্ষা পদ্ধতিতে জনশিক্ষা ব্যবস্থা বিশেষ সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু ১৮৫৪ থেকে ১৯০১ সালের মধ্যে দেশীয় স্কুলগুলি ক্রমশ অন্তর্হিত হয়ে যায়।

সরকার শিক্ষা দপ্তর খোলার ফলে ১৯০৪ সালের পর থেকে বিশেষ ধরনের তৈরী বাড়িতে নতুন ধরনের প্রাথমিক স্কুল চালু হয়। এইসব স্কুলে বিস্তৃত পাঠ্যতালিকার চলন হয়, যথেষ্ট শিক্ষিত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক নিযুক্ত হয়, নিয়মিত শিক্ষাদান ও প্রমোশনের ব্যবস্থা করা হয় এবং এখানে ছাপান বই ও নতুন ধরনের শিক্ষা সরঞ্জাম ব্যবহার করা হয়।

উনিশ শতকে শিক্ষা-জগতের বাইরের কতকগুলি কারণে শিক্ষার অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হয়, যেমন (১) ব্রিটিশের কেন্দ্রীয় ও নগরভিত্তিক প্রশাসনে গ্রামগুলি অবহেলিত হয়, (২) ব্রিটিশ প্রশাসন জনসাধারণের জীবনের মানোন্নয়নের ব্যর্থ হয় এবং (৩) শিক্ষায় আর্থিক যোগান খুব সীমিত হয়ে পড়ে। ১৮৭০ সালে মেয়োর (Mayo) নির্দেশানুসারে প্রাথমিক শিক্ষায় সরকারী অনুদান সাধারণত মোট ব্যায়ের এক-তৃতায়াংশর বেশী হত না। ১৮৭০-এ যে সময় মেয়োর আদেশ জারি হয় ঠিক সেই সময়ে ইংলণ্ডে স্থানীয় কর আদায়ের সঙ্গে বাধ্যতামূলক শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু হয়। কিন্তু ভারতে ১৮৫১ থেকে ১৮৭১-এর মধ্যে স্থানীয় কর আদায় চালু করা হয়। কিন্তু বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত থাকে।

কে. জে. সাঈডাইন (K. J. Saiyidain), জে. পে. নায়েক (J. P. Nayek) এবং আবিদ্ হোসেন (Abid Hassain) ১৮১৩ থেকে ১৯০২ পর্যন্ত সময়টিকে অবহেলার সময় বলে বর্ণনা করেন।

এঁদের মতে ভারতে প্রাথমিক শিক্ষার বিকাশের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয় ১৯০২ থেকে ১৯১৮ সালের মধ্যে প্রচণ্ড আন্দোলনের সময়ে। এই সময়ে অপ্রত্যাশিতভাবে প্রাথমিক-শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে বরোদার মহারাজা সরাজি রাও গায়কোয়াডের ভূমিকা স্পষ্ট হয়ে চোখে পড়ে। তিনি ১৯০৬ সালে বরোদা রাজ্যের সর্বত্র স্বাধীন ও বাধ্যতামূলক সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন করেন। এই ঘটনায় উৎসাহিত হয়ে রাজকীয় আইন পরিষদের সদস্য গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লে ১৯১০ সালে একটি প্রস্তাব আনেন।

এইভাবে দেখা যায় বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে ঔপনিবেশিক শিক্ষার ব্যবস্থায় খুব কমই অগ্রগতি ঘটেছে। মেকলের সংক্ষিপ্ত বিধি অনুযায়ী ভারতে একটি শাসকশ্রেণী তৈরী করার জন্য ব্রিটিশ সরকার উচ্চশিক্ষা উন্নতির ক্ষেত্রেই বেশী জোর দেয় যদিও অন্যান্য ব্রিটিশ কর্মচারী এবং চিন্তাবিদ্‌রা ব্যাপক উন্নতমানের শিক্ষাব্যবস্থার প্রসারের সুপারিশ করেন।

৩০.৩ শিক্ষায় জাতীয় আন্দোলনের প্রভাব

আগেই বলা হয়েছে যে, ১৯০৬ সালে বাংলায় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠিত হয়েছে। সেই একই বছরে বরোদার মহারাজা সরাজি রাও গাইকোয়াড সার্বজনীন, বাধ্যতামূলক ও মুক্ত প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলন করেন। গোখ্‌লে ১৯১১ সালে সাম্রাজ্যের আইন পরিষদে একটি খসড়া প্রস্তাব উত্থাপন করেন কিন্তু এটি বাতিল হয়। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। ১৯২০ সালেই কংগ্রেসের মধ্যে শিক্ষায় আধিপত্য বিস্তারের জন্য এক তীব্র জাতীয় স্বার্থ প্রতিফলিত হয়।

৩০.৩.১ জাতীয় আন্দোলন ও শিক্ষা পদ্ধতি, ১৯২০-৩৭

১৯২০ সালে নাগপুর কংগ্রেসের অধিবেশনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, ব্রিটিশ সরকারের নিজস্ব, সাহায্যপ্রাপ্ত বা নিয়ন্ত্রিত স্কুল বা কলেজের সমস্ত শিশু ও যুবকেরা পাঠ পরিত্যাগ করবে। এই সময়ে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ব্যাপকভাবে জাতীয় স্কুল ও কলেজ গড়ে তোলার চেষ্টা হয়। এই সময়েই, এক বছরেই আলিগড়ের মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, গুজরাট বিদ্যাপীঠ, কাশী বিদ্যাপীঠ, বাংলা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, তিলক মহারাষ্ট্র বিদ্যাপীঠ, লাহোরের কোয়ামী বিদ্যাপীঠ প্রভৃতির মত জাতীয় প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা হতে দেখি। দেশীয় অর্থ ও নেতৃত্ব ভারতের জাতীয় রকংগ্রেস সর্বস্তরে জাতীয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে আন্দোলন সৃষ্টি করে। এইভাবে ১৯২০ থেকে ১৯৩৭-এর মধ্যে জাতীয় ব্যক্তিগত উগ্যোগে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আন্দোলন দেখতে পাওয়া যায়। এদের দৃষ্টিভঙ্গী ও নীতি ছিল জাতীয়। ভারতীয় রাজা, বড় জমিদার ও অন্যান্য ধনাঢ্য ব্যক্তি এদের আথিক ভাবে সাহায্য করতেন আর শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বস্তরে জাতীয় নেতৃবৃন্দ সাহায্য করতেন। এই সময়ই ভারতীয় ভাষায় সংবাদ-পত্র বহুল প্রচারিত হয়। জাতির জনক ও নেতা মহাত্মা গান্ধীর বুনিয়াদি শিক্ষার এক পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিকল্পনা রচনা করা হয় আর ১৯৩৭-এর হরিপুরা কংগ্রেসে এর উপর আলোচনা ও বিতর্ক হবার পর গৃহীত হয়। ব্রিটিশ সরকার এরং সময় প্রাদেশিক স্বাধিকার প্রলচন করে ও অধিকাংশ প্রদেশেই কংগ্রেসকে ক্ষমতায় আসীন করে। সুতরাং ১৯৩৭ সালে দেশের সর্বত্রই বুনিয়াদী শিক্ষা প্রচলিত হয়।

৩০.৩.২ বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনা

বুনিদায়ী শিক্ষা পরিকল্পনা সাধারণের কাছে ওয়ার্ধা শিক্ষা পরিকল্পনা বলে পরিচিত। এই বিদ্যালয়ে হাতের কাজ শেখা এই পরিকল্পনার কেন্দ্রীয় ধারণা আর এটিকে নিয়েই পরবর্তীকালে তর্ক-বিতর্কের সৃষ্টি হয়। ১৯৩৭-এর অক্টোবরে মহাত্মা গান্ধীর সভাপতিত্বে জাতীয় কর্মীদের সমাবেশে মূল আলোচ্য বিষয় ছিল শিক্ষা হবে কায়িক শ্রম অবলম্বনে কিছু সৃষ্টিশীল কাজ। পরবর্তীকালে ১৯৭৮-এর আদেশিযিয়া কমিটিতে এই ধারণাকেই বলা হয় 'সমাজ-হিতকারী সৃষ্টিশীল কাজ'। এটা বিশ্বাস করা যেতে পারে যে, যদি শিশুরা কোন সমাজ-হিতকারী সৃষ্টিশীল কাজে অংশগ্রহণ করে তাহলে শ্রমজীবী ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বাধা দূর হয়ে শ্রমের মর্যাদার প্রতিষ্ঠা হবে। জীবনের সঙ্গে জ্ঞানের সংযোগ সাধনের জন্য এই ধারণার প্রয়োজন মনে করা হয়। বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থার বিশেষ প্রয়োজনীয় তিনটি দিক আছে, যেমন হাতের কাজ, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সামাজিক পরিবেশ। এই ব্যবস্থার সমস্ত দিকই হ'ল জীবনের মূল শিক্ষায় জ্ঞানের সাথে দক্ষতার সমন্বয় সাধন। পরবর্তীকালে এটিই অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দেখা দেয়। বুনিয়াদী শিক্ষা শেষ করতে সাত বছর সময় লাগে। চার বছরের প্রাথমিক শিক্ষা থাকলেও বুনিয়াদী শিক্ষার প্রচলন হবার পর শিক্ষার সর্ব্বস্তরে এটিই প্রধান জাতীয় প্রচেষ্টা হয়ে দেখা দেয়।

বুনিয়াদী শিক্ষায় পাঠ্যতালিকা নিম্নরূপ ঃ

১। প্রয়োজনীয় হাতের কাজ—যেমন, সুতাকাটা ও কাপড় বোনা, কাঠের কাজ, কৃষিকাজ, ফল ও শাকসব্জির বাগান করা, চামড়ার কাজ বা স্থানীয় ও ভৌগলিক পরিবেশ যে সমস্ত কাজে সাহায্য করে।

২। মাতৃভাষা ঃ ভাষা শিক্ষায় সম্পূর্ণভাবে মাতৃভাষার ওপর জোর দেওয়া হয়।

৩। অঙ্ক ঃ ব্যবস্থা-পদ্ধতি ও হিসাবনিকাশ রাখার জন্য যেন অঙ্কের ওপর জোর দেওয়া হয়।

৪। সমাজ-বিদ্যা।

৫। সাধারণ বিজ্ঞান।

৬। অঙ্কন।

৭। সঙ্গীত।

৮। হিন্দুস্থানী—শিশুরা যাতে জাতীয় ভাষায় কিছু দক্ষতা লাভ করে তার জন্য হিন্দুস্থানী কথা বলা হয়েছে। মনে রাখা প্রয়োজন, হিন্দীর বদলে হিন্দুস্থানীর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে যাতে সাধারণকথ্য ভাষা যার সঙ্গে সামান্য উর্দুও মিশ্রিত আছে তার সঙ্গে পরিচয় ঘটে।

এই পাঠ্যতালিকায় ছেলে ও মেয়ের মধ্যে কোন পার্থক্যই কাম্য বলে মনে করা হয় না। ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীতে মেয়েরা হাতের কাজের বদলে গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান গ্রহণ করবে বলা হয়।

৩০.৩.৩ সার্জেন্ট রিপোর্ট, ১৯৪৪

ঔপনিবেশিক শাসনকালে আর একটি মাত্র বিশেষ প্রচেষ্টা দেখা যায় যা ১৯৪৪-এ প্রকাশিত "যুদ্ধ পরবর্তী শিক্ষার বিকাশ" নামে, সাধারণের কাছে সার্জেন্ট রিপোর্ট বলে পরিচিত। কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা বোর্ড অনুসৃত বুনিদায়ী শিক্ষার ধারণাই সার্জেন্ট রিপোর্টে গৃহীত হয়। বুনিয়াদী শিক্ষা-ব্যবস্থাকে এই রিপোর্টে দুই স্তরে ভাগ করা হয় ঃ নিম্নবুনিদায়ী ও উচ্চ-বুনিয়াদী। নিম্ন-বুনিয়াদী স্তরে পাঁচ বছর আর উচ্চ-বুনিয়াদী স্তরে তিন বছর সময় লাগে। সাধারণভাবে এটি পাঁচ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা ও তিন বছরের মাধ্যমিক শিক্ষার সমতুল।

সার্জেন্ট রিপোর্ট কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে নিম্ন-বুনিয়াদী ও উচ্চ-বুনিদী শিক্ষার নির্দেশ দেয়।

বুনিয়াদী ধাঁচের ব্যবস্থা ছাড়াও সার্জেন্ট রিপোর্টে প্রাক্-প্রথমিক স্কুলের কথাও বলেছে। রিপোর্ট এছাড়াও দু'ধরণের হাইস্কুলের কথা বলে এবং উচ্চ-মাধ্যমিক স্কুলের পাঠক্রম চলবে ছয় বছর ধরে আর এই স্কুলে ভর্তির বয়স হবে সাধারণত এগার বছর। দু'ধরনের হাইস্কুলের পরিকল্পনা করা হয় ঃ পঠন-পাঠন ও প্রযুক্তি বিষয়ক।

উচ্চ মাধ্যমিকের ছ'বছর শিক্ষাক্রম নির্দেশ করার পরিপ্রেক্ষিতে সার্জেন্ট রিপোর্ট ইন্টারমিডিয়েট পাঠক্রম তুলে দেবার সুপারিশ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্নাতক ডিগ্রী হিসাবে সার্জেন্ট রিপোর্ট তিন বছরের স্নাতক পাঠক্রম প্রবর্ত্তন করার সুপারিশ করে। এইভাবে সার্জেন্ট রিপোর্টেই আমরা প্রথম বর্তমানের শিক্ষা কমিশনের (১৯৬৪-৬৬) ১০ + ২ + ৩ ব্যবস্থার প্রথম ভিত্তি স্থাপন করা দেখতে পাই।

অনুশীলনী ১

১। ভারতে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকারের প্রথম ঘোষণা কি ? (সঠিক উত্তরে ✓ চিহ্ন দিন)

(ক) উডের বিজ্ঞপ্তি।

(খ) ভারতীয় শিক্ষা কমিশন।

(গ) মেকলের সংক্ষিপ্ত-বিধি।

(ঘ) ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত।

২। "নিম্নমুখী পরিশোধন তত্ত্ব" বলতে কি বোঝায়? (উত্তরে জন্য দু'টি লাইন ব্যবহার করুন)

.....

.....

৩। প্রাক্-স্বাধীন ভারতে বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থা কেমন ছিল? (সঠিক উত্তরে ✓ চিহ্ন দিন)

(ক) বুনিয়াদী শিক্ষা।

(খ) শিক্ষায় বুনিয়াদী পদ্ধতি।

(গ) শিক্ষায় ওর্য়াধা পরিকল্পনা।

(ঘ) শিক্ষায় মেহ্তা পরিকল্পনা।

৩০.৪ স্বাধীন ভারতে শিক্ষা ব্যবস্থা

ভারতে শিক্ষার উন্নতির জন্য শিক্ষা কমিশন (১৯৬৪-৬৬) বেশ কিছু সংখ্যক সুপারিশ করে। ১৯৬৮-তে ভারত সরকার নীতিগতভাবে শিক্ষা কমিশনের বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ঐ সময় থেকেই ১৯৬৮-এর নীতিগত সিদ্ধান্ত অনুসরণ করেই ভারতে শিক্ষার বিকাশ হতে থাকে।

৩০.৪.১ স্কুলে ছাত্রভর্তির হার

ভারতে শিক্ষাবিকাশের ক্ষেত্রে কিছু তথ্য যথেষ্ট আগ্রহ সৃষ্টি করে। নীচের তালিকায় বয়ঃক্রম, অঞ্চল ও নারী-পুরুষ ভেদাভেদে ভারতে কতকগুলি প্রধান রাজ্যে শিশুদের উপস্থিতির শতকরা হার দেখান হয়েছে। (উৎস ঃ আদমসুমারী ১৯৮১)।

	৫-৯ বছর			১০-১৪ বছর		
	ব্যক্তি	ছেলে	মেয়ে	ব্যক্তি	ছেলে	মেয়ে
সার্বিক	৩৮.৪৫	৪৪.৩৩	৩২.২১	৫০.৪৫	৬২.০৭	৩৭.৪৭
গ্রাম	৩২.৯৫	৩৯.৬৩	২৫.৮৩	৪৪.২৭	৫৭.৭৫	২৯.১৮
শহর	৫৮.৬৯	৬১.৬৫	৫৫.৫৫	৭১.৫৮	৭৭.০০	৬৫.৬০

ওপরের তালিকা থেকে দেখা যায় ৫-৯ বছরের শিশুদের শতকরা ৯১ জন স্কুলে যায়। ৫-১১ বছরের অবশিষ্ট শিশুদের স্কুলে আনা খুব একটা অসুবিধার নয়। কিন্তু অসুবিধা হ'ল, ১০০ জনসংখ্যা অধ্যুষিত ২,০০,০০০ জনবসতি থেকে ছাত্র আনতে হবে। এছাড়াও বহু বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল ও দুর্গম এলাকা আছে। আবার নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রচলিত বিধিনিষেধও আছে। আদিবাসী ও উপজাতিদের মত সমাজের পিছিয়ে পড়া ও দরিদ্রতর শ্রেণীদেরও স্কুলে আনতে হবে। ৭ম পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল ১৯৯০ সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষায় সার্বিক উপস্থিতি নিশ্চিত করা। মাধ্যমিক স্তরে অবশ্য কিছু ঘাটতি থেকেই যাবে। চতুর্থ সর্বভারতীয় সমীক্ষার তথ্য অনুযায়ী ১১-১৪ বছরের মাধ্যমিক স্তরের এই অবস্থা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

১৯৮২-৮৩ এর মধ্যে স্বীকৃত স্কুলের সংখ্যা নিম্নরূপ ঃ

প্রাক্-প্রাথমিক স্কুল	১২,৭১৬
প্রাথমিক স্কুল	৫,০৩,৭৪১
মাধ্যমিক স্কুল	১,২৩,৩২৩
উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল	৫২,২৭৯

এতে মোট প্রায় ৭ লক্ষ স্কুলের উল্লেখ আছে। ১৯৮১-৮২তে তালিকাভুক্ত শিশুদের সংখ্যা ১০ কোটি। ১৯৮২-৮৩-তে স্কুল স্তরে প্রাথমিক-শিক্ষক সংখ্যা ১৩ লক্ষ, মাধ্যমিক স্তরে ৮.৫ লক্ষ আর উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ৯.৯৩ লক্ষ্য; মোট সংখ্যা ৩১.৪ লক্ষ্য। এতে দেখা যায় ১৯৮২-৮৩ তে ৭ লক্ষ্য স্কুল, প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ১০ কোটি ছাত্র ও মোটামুটি ভাবে ৩০ লক্ষ শিক্ষক।

আমাদের সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতিতে বলা আছে যে, রাষ্ট্র ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত প্রত্যেক শিশুকে স্বাধীন এবং বাধ্যতামুলক শিক্ষার ব্যবস্থা করবে আর এরই ফলে ভারতে স্কুল-শিক্ষার ব্যাপক প্রসার দেখতে পাই। এটা দেখা যায়, ১১ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষার লক্ষ্যে আমরা উপস্থিত হয়েছি আর মনে হয় শতকের শেষে ১৪ বছরের লক্ষ্য উত্তীর্ণ হতে পারে যাবে।

৩০.৪.২ পশ্চাদ্‌গামী রাজ্যে শিক্ষা

শিক্ষা মন্ত্রক ছাত্র ভর্তির ক্ষেত্রে নয়টি রাজ্যকে ''পশ্চাদ্‌গামী'' বলে চিহ্নিত করেছে। এই সমস্ত পশ্চাদ্‌গামী রাজ্যের ব্যাপক হারে ছাত্র ভর্তির ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সাহায্য নিয়ে বিশেষ চেষ্টা চালান হচ্ছে। মেয়ে, উপজাতি ও আদিবাসীদের থেকে ব্যাপক ছাত্র ভর্তি করার সংহত প্রচেষ্টা ছাড়াও স্কুল-বাড়ী, আসবাব-পত্র ও অন্যান্য উপাদান এবং বাড়তি শিক্ষক নিয়োগের জন্য প্রচুর পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগের প্রয়োজন। দেশের এমন কিছু অংশ আছে যেখানে প্রায়ই বন্যা হয়ে থাকে, বেশ কিছু জমি আছে নিষ্ফলা, এ ছাড়াও পাহাড়ী এলাকায় মানুষ এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে থাকে। এ কারণে, এ সমস্ত পশ্চাদ্‌গামী রাজ্যের বহু অংশে যথেষ্ট পরিমাণে ছাত্র-ভর্তি করা সম্ভব নয়। একজন শিক্ষক পরিচালিত স্কুলের হার যথেষ্ট বেশি কারণ এই সমস্ত স্কুলে আরেকজন বাড়তি শিক্ষক নিয়োগের জন্য খুব বেশী পরিমাণে অর্থের প্রয়োজন হয়। এক শিক্ষক-পরিচালিত স্কুলে বেশ কিছু ছাত্র শিক্ষকের যথেষ্ট নজর পায় না, এর ফলে তারা পড়াশোনা ছেড়ে দেয়। সার্বজনীন শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রাথমিক স্তরে আরও বেশী সংখ্যক স্কুলের প্রয়োজন হয়। যদি এর সঙ্গে মাধ্যমিক স্তরে সাধারণ শিক্ষার কথা বলা হয় এর সংখ্যা আরও বেশী হবে। আমরা নীচের তালিকা তুলে ধরতে ''Education Commission and After'' নামে ১৯৮২ প্রকাশিত জে. পি. নায়েকের বই থেকে উদ্ধৃত করতে পারি।

১ম থেকে ৫ম শ্রেণীতে ভর্তির হার (১৯৫০-৫১ থেকে ১৯৭-৭৮)

১ম থেকে ৫ম শ্রেণীতে ভর্তির হার (১০ লক্ষ অনুপাতে)

	ছেলে মেয়ে	সমষ্টি	
১৯৫০-৫১	১৩.৭৭	৫.৩৯	১৯.১৬
	(৬০-৬)	(২৪.৮)	(৪৩.১)
১৯৬৫-৬৬	৩২.১৮	১৮.২৯	৫০.৪৭
	(৯৬.৩)	(৫৬.৫)	(৭৬.৭)

১৯৭৫-৭৬	৪০.৬৫	২৫.০১	৬৫.৬৬
	(১০০.৪)	(৬৬.১)	(৮৩.৮)
১৯৭৭-৭৮	৪০.৫৪	২৪.৫২	৬৫.০৬
	(৯৭.৪)	(৬২.৬)	(৮০.৫)

*বন্ধনীর মধ্যের সংখ্যা ৬-১১ বছরের সমষ্টির শতকরা হিসেব।

৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণীতে ভর্তির হার (১৯৫০-৫১ থেকে ১৯৭৭-৭৮)

	৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণীতে ভর্তির হার (১০ লক্ষ অনুপাতে)		
	ছেলে মেয়ে	সমষ্টি	
১৯৫০-৫১	২.৫৯	০.৫৩	৩.১২
	(২০.৬)	(৪.৬)	(১২.৯)
১৯৬৫-৬৬	৭.৬৮	২.৮৫	১০.৫৩
	(৪৪.২)	(১৭.০)	(৩০.৮)
১৯৭৫-৭৬	১০.৯৯	৫.০৩	১৬.০২
	(৪৮.৬)	(২৩.৯)	(৩৬.৭)
১৯৭৭-৭৮	১২.১৯	৫.৯৬	১৮.১৫
	(৪৮.৬)	(২৪.৪)	(৩৬.৯)

* বন্ধনীর মধ্যের সংখ্যা ১-১৪ বছরের সমষ্টির শতকরা হিসেব।

উল্লিখিত তালিকা দুটিতে ১৯৭৮ পর্যন্ত ৬-১১ বছর বয়সের শিশুদের ১ম থেকে ৪র্থ শ্রেণীতে ভর্তি ৭ম পরিকল্পনার সময়ে ১৯৯০ সালে সম্ভব হয়নি। কিন্তু, দেখা যায় যে ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণীতে ১১ থেকে ১৪ বছরের মেয়েদের নাম নথিভুক্ত করা যথেষ্ট সময়-সাপেক্ষ। যদি এভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হয় তবে ২০০০ সালে কাজ সম্পন্ন হবে।

৩০.৪.৩ উচ্চ-শিক্ষা

স্বাধীনতা-উত্তর ভারত দ্রুত ও বিস্তৃত উচ্চ-শিক্ষার যুগ। ১৯৭৭-৭৮-এ উচ্চ-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল প্রায় ৯০০০ যার মধ্যে ১২৫টি বিশ্ববিদ্যালয়, ৪৭টি গবেষণা কেন্দ্র, সাধারণ শিক্ষার জন্য কলেজ ৩,৮৪৮টি, বৃত্তিমূলক শিক্ষার কলেজ ৩,৩২৮টি, আর অনান্য শিক্ষার জন্য কলেজ ছিল ১,৩৯৯টি। ১৯৭৭-৭৮এ মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল, ৫,৬৩,০০০। এই সময়ে উচ্চ-শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষক সংখ্যা ছিল ২,৩৫,০০০। জে. পি. নায়েক মন্তব্য করেন, "এ ব্যাপার...খুব আশ্চর্যের বিষয় হয়ে দাঁড়াবে যদি উচ্চ-শিক্ষার ক্ষেত্রে সংকট আরও চলতে থাকে; শিক্ষিত লোকের অধিক সৃষ্টি ক্রমবর্দ্ধমান শিক্ষিত বেকারসৃষ্টি করে ছাত্রদের মতিগতি দুর্বল করবে, শিক্ষাক্ষেত্রে অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে; প্রায়শই প্রশাসন ভেঙ্গে পড়বে, মানের অবনতি ঘটবে এবং সবার ওপরে নীতিহীনতা ও যা কিছু করা হবে তার কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকবে না।" তখনকার পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য জে. ডি. শেঠি ১৯৮৩ সালে দিল্লী থেকে প্রকাশিত তাঁর বই "The crisis and Collapse of Higher Education in India" -তে বলেন, মোট জাতীয় আয় (GNP) বছরে ৬ থেকে ৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারী ব্যয় ১১ থেকে ১২.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পয়েছে মাথাপিছু আয় বেড়েছে ৩.৫ থেকে ৪.৫ শতাংশ আর

মাথাপছু ব্যয় বেড়েছে ৯ থেকে ১০ শতাংশ। কেউ বলতে পারে না যে, সরকার ও পরিকল্পনাবিদ্‌রা শিক্ষার জন্য যথেষ্ট অর্থ যোগান দেননি।''

তিনি বলেন ''জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনের তুলনায় ভারতে বৈজ্ঞানিক জনবল এখনও যথেষ্ট কম। জনসংখ্যার প্রতি ১০০০-এ ভারতে বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের সংখ্যা ৩.৬ জন যেখানে তুলনামূলকভাবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ১২, পশ্চিম জার্মানীতে ১৯, সোভিয়েত রাশিয়ায় ৮২ ও জাপানে ১৮৫ জন।''

তিনি আরও বলেন ''আমাদের দেশে গবেষণা ও উন্নতির কাজে রত বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনীয়ারের সংখ্যা প্রতি ১০০০-এ ০.৯ জন, তুলনামূলক ভাবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ২.৬৪, পশ্চিম জার্মানীতে ২.৯৭, সোভিয়েত রাশিয়ায় ৩.৭২ ও পোলাণ্ডে ৪.৯৯ জন।''

এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের প্রাপ্ত তথ্য হিসেবে দেখা যায় নিবন্ধিকৃত চাকরী প্রার্থীর সংখ্যা ১৯৬১-তে ১৮.৩৩ লাখ থেকে ১৯৭৮-এ ১২৬.৭৪ লাখ হয়ে বার্ষিক হার দাঁড়িয়েছে শতকরা ১২। জে.ডি.শেঠি আরও বলেছেন ম্যাট্রিকুলেটদের সংখ্যা যেক্ষেত্রে বৎসরে শতকরা ১৪.৫ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, অন্যান্য উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্তদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে বার্ষিক ২৩ শতাংশ হারে।

এভাবে উচ্চশিক্ষার তথ্যগুলি চিন্তার উদ্রেক করে। একদিকে আমাদের বেশী-সংখ্যক বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ প্রয়োজন, অন্যদিকে মধ্যবর্তী স্তরে ডিগ্রীধারীদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। শেঠির মতে একজন সাধারণ স্নাতকের জন্য আমাদের বছরে ১০,০০০ টাকা ব্যয় করতে হয়। এ সমস্তই অত্যন্ত চিন্তার বিষয়।

৩০.৪.৪ উচ্চ-শিক্ষা বিস্তারের স্তর

স্বাধীনতার সময় থেকে উচ্চ-শিক্ষার ক্ষেত্রে স্পষ্ট দুটি ধারা দেখতে পাওয়া যায় ঃ (১) দ্রুত বিস্তারের সময় আর (২) স্থিতিশীলতার সময়। ১৯৭৫-৭৬ ও ১৯৮১-৮২-এর মধ্যে বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ৩.৯। দেখতে পাওয়া যায় যে, শিক্ষার বিভিন্ন শাখার মধ্যে কলা ও বাণিজ্য শাখায় বৃদ্ধির হার বিজ্ঞান শাখায় বৃদ্ধির হারের চেয়ে অনেক বেশি। স্তর বিশেষ লক্ষ্য করলে দেখা যায় স্নাতক স্তরে কলা ও বাণিজ্য শাখায় ভর্তির সংখ্যাই বেশি। উচ্চ-শিক্ষা ক্ষেত্রে স্নাতক স্তরে ভর্তির ৯০ শতাংশ এই হারেই চলছে আর গত কুড়ি বছরে এর কোন হেরফের হয়নি।

উচ্চ-শিক্ষায় অনেক অসাম্য দেখা যায় ঃ

(১) উপজাতি ও অন্যান্যদের মধ্যে; (২) আদিবাসী ও অন্যান্যদের মধ্যে; (৩) পুরুষ ও নারীর মধ্যে; এবং (৪) উন্নত ও অনুন্নত অঞ্চলের ক্ষেত্রে।

১৯৭৭-৭৮-এ সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে উপজাতিদের হার ছিল ৭.৭ শতাংশ ও বৃত্তি শিক্ষায় ৭ শতাংশ। উচ্চ-শিক্ষায় নারীদের অংশ ছিল ২৭.৭ শতাংশ। পুরুষ ও নারী উচ্চ-শিক্ষায় অনুপাত ছিল ৩ ঃ ১।

৩০.৪.৫ উচ্চ-শিক্ষার সমস্যা

উচ্চ শিক্ষার প্রধান সমস্যাগুলি ছিল ঃ

১। প্রবণতার সমস্যা ঃ

(ক) গুণগত বনাম পরিমাণগত (খ) সমতা বনাম দক্ষতা

(গ) মূল্যবোধ বনাম উপযোগিতা (ঘ) প্রতিজ্ঞাবদ্ধতা বনাম বিচ্ছিন্নতা

২। বিষয়ের সমস্যা ঃ

(ক) সংশ্লেষ ও বিশ্লেষ (খ) শিক্ষা ও শিক্ষণ

(গ) বিশেষজ্ঞ ও সাধারণবোধ-সম্পন্ন

৩। পরিচালনার সমস্যা ঃ

(ক) এককেন্দ্রীকরণ ও বিচ্ছুরণ (খ) স্বাধিকার ও দায়িত্ববোধ

(গ) গণতন্ত্র ও কেন্দ্রীকরণ (ঘ) মূল্যবোধ ও মূল্য-আরোপন

অনুশীলনী ২

১। স্বাধীনোত্তর ভারতে ১৯৬৮ পর্যন্ত কোন্ শিক্ষাপদ্ধতি অনুসৃত হয়? (সঠিক উত্তরে (✓) চিহ্ন দিন)

(ক) সার্জেন্ট রিপোর্ট (খ) নওরোজী রিপোর্ট

(গ) মেকলে রিপোর্ট (ঘ) নায়েক রিপোর্ট

২। শিশুদের ভর্তির ক্ষেত্রে ক'টি রাজ্যকে পশ্চাদ্‌গামী বলে চিহ্নিত করা হয়? (সঠিক উত্তরে (✓) চিহ্ন দিন)

(ক) ৫টি রাজ্য (খ) ৬টি রাজ্য

(গ) ৯টি রাজ্য (ঘ) ১০টি রাজ্য

৩। ভারতে উচ্চ-শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে কয়টি পর্যায় দেখা যায়? দু-লাইনে উত্তর দিন।

.....

.....

৪। উচ্চ-শিক্ষার তিনটি প্রধান সমস্যা উল্লেখ করুন।

(ক) .....

(খ) .....

(গ) .....

৩০.৫ নতুন শিক্ষানীতির অভিমুখে

বর্তমানে ঘোষিত নয়া শিক্ষা ব্যবস্থার চারটি দিক আছে। এগুলি হ'ল ঃ

(ক) পরিমাণগত বিস্তার

(খ) ন্যায়পরায়ণতা

(গ) ঔৎকর্ষ ও উদ্ভাবনী-শক্তি

(ঘ) জাতীয়, মানবিক ও বৈজ্ঞানিক মূল্যবোধ

৩০.৫.১ পরিমাণগত বিস্তার

প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা ১৯৫১-তে ২০.৯ লাখ থেকেবৃদ্ধি পেয়ে ১৯৮৫-তে ৫.৫ লাখ হয়েছে। মধ্যবর্তী শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠান ১০ গুণ ও মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য ৯ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৮৫-তে মধ্য শিক্ষার জন্য স্কুল ১$^{১}/_{২}$ লাখ ও মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা এই সময়ের মধ্যে ৬০,০০০ হয়েছে। ১৯৫০-৫১-তে ৫৪৮টি কলেজ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৮৫-তে ৩,৫০০টি হয়েছে। এই সমস্ত সংখ্যা কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য শিক্ষার কলেজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এর সাথে যদি বৃত্তিমূলক শিক্ষার কলেজ যোগ করা হয় তাহ'লে ১৯৮৫তে কলেজের মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ৫,০০০। শিক্ষায় এ এক ব্যাপক বিস্তার। আগেই বলা হয়েছে, ১৯৮৫-তে ছাত্রের সংখ্যা ১০ কোটির বেশী আর শিক্ষক সংখ্যাও ৩৫ লক্ষের বেশী। মোটামুটিভাবে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ও শিক্ষার প্রতি দায়িত্ববোধ থেকে বলা যেতে পারে যে সামনের কয়েক বছরে শিক্ষার পরিমাণগত বিস্তারের হার বেশি হবে।

অবশ্যই চোখে পড়বে যে, উপজাতি ও আদিবাসীদের মধ্যে এবং দরিদ্রতর শ্রেণীর জনসংখ্যার ক্ষেত্রে মেয়ে ও শিশুদের ভর্তির হার যথেষ্টই কম। আগেই বলা হয়েছে, এজন্য বিশেষ ব্যবস্তা নেওয়া হচ্ছে ৯টি নির্দিষ্ট রাজ্যে। যেখানে মেয়েদের তপশীলিজাতি ও আদিবাসীদের, ভর্তির হার খুব কম।

পরিমাণগত বিস্তার শুধুমাত্র প্রথাগত কয়েক বিভাগেই সীমাবদ্ধ নয়। প্রথা-বর্হিভূত শিক্ষার ক্ষেত্রেও এর বিস্তার হতে হবে। প্রথা-বর্হিভূত শিক্ষার প্রয়োজন পাহাড়ী এলাকা, বিশে, করে আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা, শহরাঞ্চলে বস্তি ও শিশু শ্রমিক প্রভৃতিদের এলাকা।

৩০.৫.২ ন্যায়পরায়ণতা

নয়া শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার সুযোগের সমতার উপরে জোর দিয়েছে, বিশেষতঃ, যারা এতদিন সমান সুযোগ থেকে বঞ্চিত থেকেছে তাদেরই নির্দিষ্ট প্রয়োজনের ক্ষেত্রে।

১। **নারীর সমতার জন্য শিক্ষা ঃ** শিক্ষাকে নারীর মর্যাদার ক্ষেত্রে মৌল পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হবে। নয়া শিক্ষা ব্যবস্থায় নতুন ভাবে রচিত পাঠ্যতালিকা, পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষকদের শিক্ষণ ও মনোভাদ পরিবর্তন, সিদ্ধান্ত-গ্রহণকারী, প্রশাসক এবং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কার্যকরী ভূমিকা সহযোগে নতুন মূল্যবোধ সৃষ্টি করবে। কর্মমুখী, প্রযুক্তি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে নারীদের অংশগ্রহণে বিশে, জোর দেওয়া হবে।

২। **তপশীলভুক্ত জাতির জন্য শিক্ষা ঃ** সারা দেশে শিক্ষার সমস্ত স্তরে ও পর্যায়ে তপশীলি জাতি ও অ-তপশীলি জাতির মধ্যে সমতা আনাই তপশীলি জাতির শিক্ষার উন্নতির কেন্দ্রবিন্দু। এই উদ্দেশ্যে নিম্নেলিখিত কতকগুলি বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবেঃ

(ক) দরিদ্র পরিবারগুলিকে তাদের সন্তানদের ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত নিয়মিত স্কুলে পাঠাবার জন্য বিশেষ উৎসাহ দানের ব্যবস্থা।

(খ) নীচুস্তরের, অত্যন্ত অধস্তন কাজে নিযুক্ত পরিবারে, য়েমন মেথর ইত্যাদির সন্তানদের প্রাক্-ম্যাট্রিক বৃত্তিপ্রদানের ব্যবস্থা।

(গ) তপশীলি জাতির মধ্য থেকেই শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে ও নিকটবর্তী এলাকায় স্কুল বাড়ী তৈরী করতে হবে যাতে ঐ জাতিভুক্ত শিশুরা সহজেই আসতে পারে। নয়া শিক্ষা নীতিতে এ ধরনের কতকগুলি ব্যবস্থার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

৩। **আদিবাসীদের শিক্ষা ঃ**

(ক) আদিবাসী এলাকায় প্রাথমিক স্কুল স্থাপনকে প্রাধান্য দিতে হবে।

(খ) শিক্ষিত ও উদ্যোগী আদিবাসী-যুবকদের আদিবাসী এলাকায় শিক্ষকতার জন্য উৎসাহ ও প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

(গ) আবাসিক স্কুল ও আশ্রম-বিদ্যালয় প্রভৃতি ব্যাপক প্রচলন করতে হবে।

নয়া শিক্ষা-নীতিতে এ-ধরনের কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব করা হয়েছে।

এই নীতি শিক্ষার দিক থেকে পিছিয়ে পড়া অংশ ও অঞ্চল, বিশেষ করে গ্রামীন এলাকা, পার্বত্য ও মরুভূমি অঞ্চল, দূরবর্তী ও দুর্গম্য এলাকা এবং দ্বীপ অঞ্চলে বিশেষ কতকগুলি পরিকল্পনার উল্লেখ করেছে। সাম্য ও সামাজিক ন্যায়-বিচারের প্রয়োজনে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি কতকগুলি বিশেষ, মনোযোগ দিতে হবে।

৩০.৫.৩ ঔৎকর্ষ ও উদ্ভাবনী শক্তি

এই নীতির প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, "প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবিশেষের কাজের ঔৎকর্ষকে স্বীকৃতি দিতে ও পুরস্কৃত করতে হবে। নিম্ন-মানের প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব রোধ করতে হবে। সমস্ত বিভাগকে সংশ্লিষ্ট করে উৎকর্ষ ও উদ্ভাবনীশক্তি সৃষ্টির পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে।"

"নির্দিষ্ট কিছু প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব ও নিরাপত্তা সহ বিভিন্ন মাত্রায় অন্তর্নিহিত শিক্ষা-প্রশানের ও আর্থিক স্বাধিকার দিতে হবে।" সেকেলে মনোভাব দূর করে বেশী মাত্রায় আধুনিকীকরণের সুযোগ করে দিতে হবে।

৩০.৫.৪ জাতীয়, মানবিক ও বৈজ্ঞানিক মূল্যবোধ

নয়া শিক্ষা ব্যবস্থায় ঘোষণা করা হয়েছে, "প্রয়োজনীয় মূল্যবোধের ক্রমবর্দ্ধমান অবক্ষয় ও সমাজে নৈরাশ্য শিক্ষকে সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশসাধনের হাতিয়ার করার উদ্দেশ্যে পাঠক্রমের পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে।"

"আমাদের কৃষ্টিগত বহুত্ববাদী সমাজে জনগণের ঐক্য ও সংহতি রক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা এবং সার্বজনীন ও অবিভক্ত মূল্যাবোধকে রক্ষা করা উচিত। শিক্ষার অজ্ঞতা, ধর্মান্ধতা, উগ্রতা, কু-সংস্কার ও অদৃষ্টবাদ দূর করতে সাহায্য করা উচিত।"

"এই সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বী ভূমিকা ছাড়াও উত্তরাধিকার, জাতীয় লক্ষ্য ও সার্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে মূল্যবোধ-শিক্ষার এক গভীর সুস্পষ্ট যোগ আছে। এই সারমর্মের দিকেই শিক্ষার প্রথম জোর দেওয়া উচিত।" এখানে বিশেষ করে বলা দরকার যে, জাতপাতের বিভিন্ন লক্ষ্যণীয় গতিপ্রকৃতি, সংকীর্ণ ভাষাগত বিবেচনা ও সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয়তাবোধ সম্পর্কে মূল্যবোধ, মানবিকতা ও সাধারণভাবে বৈজ্ঞানিক মূল্যবোধের উপর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন। যে কেউ সমকালীন ভারতের ইতিহাস পাঠ করলে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে, নানা জাতপাতের মধ্যে ও নানা সাম্প্রদায়িক শ্রেণীর মধ্যে বহু দ্বন্দ্বের ঘটনায় অবাক হয়ে যাবে। স্কুল স্তরে ও পরবর্তীকালের শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে এই সমস্ত বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রভাবের মোকাবিলা করা। সর্বস্তরের পাঠক্রম ও পাঠ্যপুস্তকে তাই অবশ্যই মানবিকতা, জাতীয়তাবাদ ও বৈজ্ঞানিক চেতনার মূল্যবোধ উজ্জীবিত করার কথা স্পষ্ট বিষয় হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

৩০.৬ প্রযুক্তি, শিক্ষা ও সমাজ-পরিবর্তন

সমাজ পরিবর্তনের দুটি উল্লেখযোগ্য দিক হ'ল ঃ শিক্ষা ও প্রযুক্তির বিকাশ। সভ্যতার ইতিহাসে দেখা যায়, উৎপাদন পদ্ধতির উন্নতির সাথে সাথে বিবর্তনের পথে মানুষ কয়েক ধাপ এগিয়ে যায়। এটা অবশ্যই লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য যে, মানব-সমাজের বিকাশে নতুন উৎপাদনের পদ্ধতি আবিষ্কারের সাথে সাথে মানুষ প্রকৃতি ও অন্যান্য মানুষের সঙ্গে নতুন সম্পর্কবোধ সৃষ্টি করতে বাধ্য হয়। মুদ্রণ প্রযুক্তির বিকাশ মানুষের জ্ঞানের রাজ্যে এক প্রচণ্ড অগ্রগতি সৃষ্টি করে ও পৃথিবীব্যাপী এর বিস্তারের বিশেষ, গতি দেখা যায়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভাবে তাই আমরা খাদ্য উৎপাদনে বিশাল পরিবর্তন দেখতে পাই। অবশ্য প্রযুক্তি ব্যাপক হারে মানুষের ধ্বংস অনিবার্য করে ফেলেছে, তাই আজ সঠিক প্রযুক্তির প্রশ্ন এত অনিবার্য হয়ে পড়েছে। সাম্প্রতিক কালে তথ্য প্রযুক্তির বিকাশ এক ব্যাপক বিষয় হিসাবে চিহ্নিত, যেমন দেখা গিয়েছে মানব-সমাজের বিকাশের গোড়ার দিকে অর্থাৎ পরিবর্তন যখন মানুষকে অভিযোজনীয় পরিবর্তন আনতে বাধ্য করেছিল। মানব-সমাজের কাহিনী একটি বিশেষ ধাঁচের শিল্প বা কারিগরীর পদ্ধতি বা অন্যকিছু সৃষ্টি যা মানুষের ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তোলে, তার কাহিনী বলে মনে হয়। নতুন প্রযুক্তি সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে নতুন শিক্ষার প্রয়োজন এবং তা মানব সম্পর্কের মধ্যে যথাযথ পরিবর্তনও আনে। এ কারণে সমাজ পরিবর্তনের জন্য শিক্ষা ও প্রযুক্তির গুরুত্ব সঠিকভাবে অনুধাবন করা উচিত।

শিক্ষাই ব্রিটিশ যুগে ভারতীয়দের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনে মৌলিক ও স্থায়ী পরিবর্তন এনেছিল। শিক্ষাই সমাজে নতুন প্রতিষ্ঠান, জ্ঞান, বিশ্বাস ও মূল্যবোধের সৃষ্টি করেছে। আধুনিক জীবনধারা সৃষ্টি, প্রাগ্রসর যোগাযোগ ব্যবস্থা, আমলাতন্ত্র, আইন ও বিচার ব্যবস্থায় অধিক হারে ভারতীয়দের অংশ গ্রহণ এবং ক্রমবর্দ্ধমান রাজনৈতিক কার্যাবলী সম্ভব হয়েছে শিক্ষার দ্বারা। স্কুল ও কলেজের বিস্তার ও মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে ভারতের এক বিশাল সংখ্যক মানুষের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে আধুনিক ও সনাতন জ্ঞান বিতরণ সম্ভব হয়। বই, পত্র-পত্রিকা ও সংবাদপত্রের প্রকাশন জনগণের কাছে জ্ঞানের জগতের সীমারেখাকে এগিয়ে দেয়।

সাধারণভাবে সমাজ-পরিবর্তনের পথে ও সংস্কৃতয়াণ, পশ্চিমীকরণ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয় চেতনার উদ্বোধনে শিক্ষা যথেষ্টই অবদান রেখেছে।

সমাজে জনসাধারণের এক বিশেষ, অংশের ক্ষমতা ও মর্যাদা বৃদ্ধিতে শিক্ষা একটি বিশেষ উপাদান হিসেবে কাজ করেছে। শহরাঞ্চলে কর্মসৃষ্টির সুযোগের বাইরেও শিক্ষিত-সমাজে বিশেষ আত্ম-মর্যাদাবোধের সৃষ্টি করেছে শিক্ষা। সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য কমাতে ও শিক্ষিত-জনসমাজের সংহতি বাড়াতে শিক্ষা বিশেষভাবে কার্যকরী। ভারতীয় জনসমাজের সমস্ত অংশ যদিও সমানভাবে শিক্ষার সুযোগ পায়নি; তবুও মূল্যবোধ, আচরণ ও জীবনধারায় পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ও সমাজে নতুন আদর্শ সৃষ্টিতে শিক্ষা অবশ্যই বিশেষ অবদান রেখেছে।

গ্রামাঞ্চলে কোন বিশেষ জাতের প্রাধান্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে শিক্ষাকেই একটি বিশেষ, বৈশিষ্ট্য বলে ধরা হয়। জাতপাত ব্যবস্থায় শিক্ষাই উল্লম্বী সচলতা (upward mobility) ঘটাতে সাহায্য করে। সাধারণতঃ জাতপাতের ক্ষেত্রে সংস্কৃতায়াণের ফলে উল্লম্বী সচতলা ঘটে থাকে। অবশ্যই শিক্ষার ফলেই এ সমস্ত ঘটে থাকে।

পশ্চিমীকরণের শক্তিগুলি শিক্ষার জোরে কার্যকরী হয়। পশ্চিমীকরণ পুরানো প্রথার পরিবর্তন ঘটিয়েছিল (সতী প্রথা, শিশুবিবাহ, বর্ণাশ্রম ইত্যাদি) ও নতুন প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করে (যেমন সংবাদপত্র, নির্বাচন, আমলাতন্ত্র, আইন ও বিচার ইত্যাদি। পশ্চিমীকরণ মানবিকতাবাদের মূল্যবোধ সৃষ্টি করে যা মানব-হিতের জন্য বর্ণ, অর্থ, ধর্ম, বয়স ও নারী-পুরুষ প্রভৃতি নির্বিশেষে সচেতনভাবে কার্যকর থাকে।

শিক্ষা ভারতে আধুনিকীকরণের প্রভাবকে মসৃণ করেছে। পশ্চিমী দেশগুলির সঙ্গে তাদের চিন্তাধারা, মূল্যবোধ, আকাঙ্ক্ষা ও সংস্কৃতির লেনদেনের পথও এর ফলে জোরদার হয়ে ওঠে। এই সময়ে সমাজ-চিন্তার ক্ষেত্রে শিক্ষা অবশ্যই বিশেষ, অবদান রেখেছে ও প্রবুদ্ধীকরণের শক্তিগুলিকে উদ্দীপ্ত করেছে। রাজা রামমোহন রায় বাংলায় নবজাগরণের সূত্রপাত করেন।

শিক্ষা ভারতীয় সমাজে 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র প্রক্রিয়াকে সহজতর করেছে। ধর্মীয় বলতে আগ যা বোঝাত 'ধর্মনিরপেক্ষতা' বলতে এখন আর তা বোঝায় না এবং সমাজের বিভিন্ন দিকে, অর্থনীতি, রাজনীতি, আইন ও নৈতিকতায় এর বিভিন্ন প্রায়োগ আছে। প্রচলিত বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও মতবাদের পরিবর্তন হিসেবে এই ব্যবস্থা যুক্তিবাদী আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রসার করেছে।

শিক্ষা ভারতে জাতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার পথ প্রস্তুত করেছে। এদেশের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ই স্বাধীনতা আন্দোলনে মূল নেতৃত্ব দিয়েছেন।

স্বাধীনোত্তর ভারতে শিক্ষাকেই দ্রুত সমাজ পরিবর্তন, অর্থনৈতিক উন্নতি ও সমাজে আধুনিকতার ভিত্তিপ্রস্তর বলে মনে করা হয়। সমাজের নিম্নশ্রেণীর উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষা এক নির্দ্ধারক ভূমিকা পালন করেছে। যাই হোক, শিক্ষার ক্ষেত্রে সমান সুযোগই ভারতের বিশাল জনগণকে সাম্য, সৌভ্রাতৃত্ব ও ন্যায়ের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে পারে।

ভারতে ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থাই শিক্ষিত বেকার সমস্যার সৃষ্টি করেছে। আমাদের শিক্ষা নীতিকে নতুন ধারায় পরিচালিত করার এটা যথেষ্ট উপযুক্ত সময়। আমাদের সমাজের পরিবর্তিত প্রয়োজনের জন্যই নয়া শিক্ষা নীতি তৈরী হয়েছে।

অনুশীলনী ৩

১। নয়া শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় চারটি দিক কি কি ?

(ক) .....

(খ) .....

(গ) .....

(ঘ) .....

২। শিক্ষায় সমান সুযোগের জন্য কোন্ কোন বিশে, ক্ষেত্রে জোর দেওয়া হয়েছে?

.....

.....

৩০.৭ সারাংশ

এই এককে ভারতে শিক্ষার উন্নতির বিভিন্ন স্তরগুলি আলোচনা করা হয়েছে। ঔপনিবেশিক ও তার পরবর্তীকালের শিক্ষা নীতিসমূহকে এখানে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। ঔপনিবেশিক ও জাতীয় সরকারের শিক্ষা নীতির প্রধান উপাদানগুলি এখানে তুলে ধরা হয়েছে। শিক্ষার পরিবর্তনের প্রধান সমস্যাগুলির সাথে সাথে এখানে শিক্ষা-ব্যবস্থাও নিরীক্ষণ করা হয়েছে। এই এককে ভারতে উন্নতি ও সমাজ পরিবর্তনের বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

৩০.৮ গ্রন্থপঞ্জী

Agarwal, J.C. : Landmark in the History of Modern Indian Education, 1984. Vikas Publishing House, New Delhi.

Naik, J. P. The Education Commission and After. Allied Publishers, 1982. New Delhi.

Srinivas, M.N. : Social Change in Modern India. Orient Longman, 1967. New Delhi.

৩০.৯ উত্তরমালা

অনুশীলনী ১

১। (গ)

২। ইংলণ্ডের অভিজাতশ্রেণীর অনুরূপে ভারতে একটি শাসকশ্রেণী গড়ে তোলা।

৩। (গ)

অনুশীলনী ২

১। (ক)

২। (খ)

৩। দ্রুত বিস্তারের যুগ ও স্থিতিস্থাপতার যুগ।

৪। প্রবণতার সমস্যা, বিষয়ের সমস্যা, পরিচালনের সমস্যা।

অনুশীলনী ৩

১। (ক) গুণগত বিস্তার।

(খ) সমতা।

(গ) উৎকর্ষ ও উদ্ভাবনী শক্তি।

(ঘ) জাতীয় ও মানবিক ও বৈজ্ঞানিক মূল্যবোধ।

২। নারীর সমান অধিকারের জন্য শিক্ষা, তপশীলিজাতির জন্য শিক্ষা, আদিবাসীদের জন্য শিক্ষা।

পর্যায় ৮

ভারতবর্ষ ও বর্তমান বিশ্ব

আগের পর্যায়গুলিতে ভারতীয় প্রেক্ষিতে সমাজ পরিবর্তন ও তার প্রক্রিয়া সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে পাঠ দেওয়া হয়েছে। বর্তমান পর্যায়ে ঐ সমস্যাগুলিই বৃহত্তর আর্ন্তজাতিক প্রেক্ষিতে স্থাপন করে আলোচনার চেষ্টা হবে। এজন্য চারটি আলোচ্য বিষয়বস্তু চিহ্নিত হয়েছে। বিস্তারিত ভাবে সেগুলি হল ঃ শান্তি, বাস্তুরীতি, বৈজ্ঞানিক মানসিকতার প্রসারণ এবং বর্ণবৈষম্য ও সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

একক ৩১-এ বর্ণবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চলতি সংগ্রাম সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হবে। সেখানে বলা হবে পুরোন, অবশিষ্ট উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে তৃতীয় দুনিয়ার একাধিক দেশে যে সংগ্রাম চলছে তার কথা (যেমন, পশ্চিম সাহারা অঞ্চলে) এবং বিশেষ করে শক্তিশালী নয়া উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধেও — যুগপৎ বহুজাতিক সংস্থাসমূহের রাজনৈতিক কৌশলের এবং সামরিক শক্তি প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে যার প্রকাশ দেখা যাচ্ছে। দক্ষিণ আফ্রিকার মত দেশসমূহে এই নয়া উপনিবেশবাদ বর্ণদ্বেষী মতবাদ এবং অভ্যন্তরীণ বিসংবাদ ছড়াতেও উস্কানি দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে ভারতের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত প্রগতিশীল এবং আধিপত্যের এইসব নিদর্শনের বিরুদ্ধে ভারত নিরন্তর প্রতিবাদ জানিয়ে এসেছে। ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম এ সব দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রাপ্তিতে প্রভূত উৎসাহ জুগিয়েছে।

৩২ সংখ্যক এককে পরমাণু অস্ত্রের প্রসারের ফলে যে অদ্ভুত বিশ্ব পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, তার পরিচয় দেওয়া হবে। মহাশক্তি সমূহের সংঘাত চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে গেলে যে পারমাণবিক শৈত্যের বিভীষিকা দেখা দিতে পারে এবং এই দুর্দিন ঠেকিয়ে রাখতে অধুনা শান্তির সপক্ষে যেসব উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে সে বিষয়ে বিশেষ আলোকপাত করা হয়েছে। শান্তির সপক্ষে নেওয়া উদ্যোগে দুনিয়া জোড়া শান্তি-আন্দোলনের গুরুত্বও এখানে দেখানো হয়েছে। শান্তি ও অহিংসা সম্বন্ধে গান্ধীজীর মতামতের আলোচনা শান্তির এই বিকল্প চেহারাকে আরও মূর্ত করে তুলবে।

বিশ্বব্যাপী প্রতিবেশ ভারসাম্যহীনতার সমস্যার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে ৩৩ সংখ্যক এককে। প্রতিবেশ ভারসাম্যের প্রকৃতি বর্ণনাপ্রসঙ্গে এই এককে লোভার্ত বহুজাতিক সংস্থাগুলির প্ররোচনায় যে ব্যাপক অরণ্যসংহার (যেমন ইন্দোনেশিয়ায়) চলছে তার ওপর বিশেষ আলোকপাত করা হয়েছে। ঐ সঙ্গে পেট্রোরাসায়নিক অথবা পরমাণুজাত শক্তি কিংবা সাম্প্রতিককালের পরমাণু অস্ত্রপ্রসারের বাড়াবাড়ি প্রতিবেশ ভারসাম্যকে যেরকম স্থায়ীভাবে বিঘ্নিত করছে সে বিষয়েও অনেক কিছু জানা যাবে। বলা দরকার, এখানেই শান্তি ও পরিবেশের প্রশ্নগুলি এক জায়গায় চলে আসে।

৩৪ সংখ্যক এককের আলোচ্য বিষয় বিজ্ঞানমনস্কতা এবং তার প্রসার। এখানে নেহরু ও বৈজ্ঞানিক মানসিকতা বিষয়ক আলোচনা এককটিকে যথার্থ প্রেক্ষিত স্থাপন করে। নেহরু যে কথা বলেছেন, বৈজ্ঞানিক মানসিকতার প্রসার ঘটালেই আমরা একদিকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের কাঠামো এবং অন্যদিকে ক্রমবর্ধমান আন্তঃরাষ্ট্র প্রবণতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতে পারব। সমকালীন এই সব সমস্যার মোকাবিলা করা যায় একমাত্র বিজ্ঞানমনস্কতা বৃদ্ধির জোরেই।

তাহলে এই পর্যায়ে ভারতবর্ষকে বিশ্বপ্রেক্ষাপটে রেখে আলোচনা চলতে থাকবে। এর মধ্য দিয়ে আমাদের সমকালীন বেশ কিছু বিপত্তিরও স্বরূপ বুঝতে সুবিধে হবে।

একক ৩১ □ স্বাধীনতা সংগ্রাম ও বর্ণগত সমতা

গঠন

৩১.১ উদ্দেশ্য

৩১.২ প্রস্তাবনা

৩১.৩ ভারতের স্বাধীনতা অর্জন ও উপনিবেশ উচ্ছেদে তার প্রভাব

- ৩১.৩.১ এশিয়ার মুক্তি সংগ্রাম
- ৩১.৩.২ আফ্রিকার মুক্তি সংগ্রাম
- ৩১.৩.৩ ভারতের স্বাধীনতার প্রভাব

৩১.৪ উপনিবেশ বাদ ও তার অবশিষ্টাংশ

- ৩১.৪.১ দক্ষিণ এশিয়া
- ৩১.৪.২ নামিবিয়া
- ৩১.৪.৩ পশ্চিম সাহারা
- ৩১.৪.৪ দিয়েগো গার্সিয়া

৩১.৫ নয়া উপনিবেশবাদের বিবিধরূপ

- ৩১.৫.১ তিনটি রূপ
- ৩১.৫:২ অর্থনৈতিক রূপ
- ৩১.৫.৩ রাজনৈতিক রূপ
- ৩১.৫.৪ সামরিক শক্তির ভূমিকা

৩১.৬ বর্ণবৈষম্য এক অবৈজ্ঞানিক মতাদর্শ ও নয়া উপনিবেশবাদের সহায়ক

- ৩১.৬.১ 'বর্ণ' শব্দটির অর্থ
- ৩১.৬.২ বর্ণ বা জাতিভেদ শোষণে এক হাতিয়ার
- ৩১.৬.৩ ঔপনিবেশিক ক্রিয়াকলাপ ও তার প্রভাব
- ৩১.৬.৪ বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে ভারতের সংগ্রাম

৩১.৭ অনুশীলনী

৩১.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ার পর আপনি জানতে পারবেন —

- এশিয়া ও আফ্রিকার স্বাধীনতা ও সাম্যের জন্য সংগ্রামে একটি নাতিদীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত।
- এই সব সংগ্রামের প্রেরণাস্থল।
- স্বাধীনতা ও সাম্যের জন্য চলতি সংগ্রাম সমূহের পরিচয়।
- এইসব সংগ্রামের সমকালীন শত্রুপক্ষ যারা নয়া উপনিবেশবাদ ও বর্ণবাদের সঙ্গে যুক্ত।
- স্বাধীন ও সমতাভিত্তিক বিশ্বনির্মাণে ভারতের অবদান।

৩১.২ প্রস্তাবনা

এশিয়া ও আফ্রিকার জনসাধারণের স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ও চাহিদা ছিল আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও সমতা। সমতার প্রশ্নটি প্রধান হয়ে ওঠে কারণ দীর্ঘদিন ধরে ইউরোপীয় উপনিবেশি শক্তি অ-ইউরোপীয়দের বুদ্ধিগত দৈন্যের দোহাই দিয়ে তাদের শাসন করার ও সভ্য করে তোলবার অধিকার ভোগ করে আসছিল। এই হীনতা থেকে মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলি সংগঠিত হয়ে উঠতে থাকে।

বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি আশ্চর্য বলে মনে হলেও জুলে ফেরি (Jules Ferry) নামক এক ফরাসী বুদ্ধিজীবী ভারত, চীনের উপর ফরাসী আগ্রাসনের সমর্থনে বলে, নিম্নজাতিকে সভ্য করে তোলার দায়িত্বভার পালনের উদ্দেশ্যেই উচ্চতর জাতি এই ধরনের নীতি গ্রহন করে থাকে। ইংরাজ কবি কিপলিঙ (Kipling) এশিয়দের সভ্য করার জন্য শ্বেতাঙ্গদের দায়িত্বের কথা বলেছেন। মার্কিন রাষ্ট্রপতি ম্যাকিনলি (Mckinely) ফিলিপিন আক্রমণের সমর্থনে বলেন ফিলিপীয়দের শিক্ষিত, উন্নত, সভ্য ও খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করার উদ্দেশ্যেই এই ঘটনা ঘটে।

এই যুক্তিগুলি নিছক আবরণমাত্র। প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল বাজার, রসদের উৎস, পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্র, সামরিক ঘাঁটির উপযুক্ত স্থান ও সামরিক বাহিনীতে সংখ্যাবৃদ্ধি এবং উৎপাদনের জন্য শ্রমিকের যোগানের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ করা।

স্বাধীনতা আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল দুটি ঃ প্রথমত ইউরোপীয় বা শ্বেতাঙ্গদের জাত্যাভিমানের অসারতা প্রমাণ করে দেওয়া এবং দ্বিতীয়ত আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে মানুষ ও সম্পদের উপর শ্বেতাঙ্গদের শোষণের অবসান ঘটানো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ভারতবর্ষই প্রথম স্বাধীনতা অর্জনে সফল হয়।

এশিয়া ও আফ্রিকার অন্যান্য দেশগুলির উপর ভারতের উপনিবেশিকতা বিরোধী আন্দোলনের গভীর প্রভাব পড়ে। ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধ অন্যান্য দেশের আশা আকাঙ্খার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। এটি ছিল একটি আন্তর্জাতিক সংগ্রামের অচ্ছেদ্য অংশ। আফ্রিকার স্বাধীনতা সংগ্রামে সহযোগিতা ও বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়ে ১৯৫৫ সালের ১৮-২৪ এপ্রিলে বানদুং-এ অনুষ্ঠিত এশিয়া আফ্রিকা জতীয় সম্মেলনে নেহরু মন্তব্য করেন, "It

is upto Asia to help Africa to the best of her ability because we are sister continents. We are determined not to fail and in this new phase of Asia and Africa to make good....." (আফ্রিকাকে সাহায্য করা এশিয়ার একান্ত দায়িত্ব, কারণ আমরা সহোদরা দুই মহাদেশ এশিয়া ও আফ্রিকার উন্নয়নের এই সম্ভাবনাময় যুগকে যেন অবহেলা না করি)

৩১.৩ ভারতের স্বাধীনতা অর্জন ও উপনিবেশিকতা উচ্ছেদে তার প্রভাব

উপনিবেশিকতা উচ্ছেদের অর্থ হল ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ও স্বাধীনতা লাভ — রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উভয় অর্থেই। প্রশ্ন হল ঃ এশিয়া ও আফ্রিকায় উপনিবেশ বিরোধী সংগ্রামে ভারতবর্ষে কী কোন প্রভাব ফেলেছে? দেখা যাচ্ছে সর্বপ্রথম স্বাধীনতা অর্জনের সুবাদে ভারতের দিক থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দু'রকম প্রভাবই পড়েছে। ভারতীয় সংগ্রাম পদ্ধতির সাফল্য বিশেষত আমজনতার অংশগ্রহণ। ঔপনিবেশিক বিধি-বিধান অমান্য করা, বিদেশ থেকে আমদানি পণ্য বর্জন, কর্মবিরতি, বাজার বন্ধ করে দেওয়া এবং অগণিত দেশ প্রেমিকের কারাবরণ — অন্যত্র সমগ্র এশিয়া ও আফ্রিকাবাসীকে গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ করে। ভারতে সাফল্যের সঙ্গে পরীক্ষিত এই সব পদ্ধতি তাঁদের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁরা প্রয়োগ করেছেন।

৩১.৩.১ এশিয়ার মুক্তি সংগ্রাম

স্বাধীনতা সংগ্রাম বেশির ভাগ দেশগুলোতে শুরু হয়েছিল বিংশ শতাব্দের সূচনাতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন হিটলার যখন ইউরোপকে গ্রাস করছিলেন সেই সময় জাপান এশিয়ায় আক্রমণ চালায় এবং ছোট দেশগুলিতে আধিপত্য বিস্তার করে। প্রতিটি জাতীয়তাবাদী এশিয় দেশ জাপানের এই দখলদারি প্রতিহত করেছিল।

১৯৫৫-র আগস্ট মাসে যখন মিত্র দেশগুলি জাপানকে পরাজিত করল তখন থেকে উপনিবেশ উচ্ছেদের কাজটি ত্বরান্বিত হয়। ফরাসী, ওলন্দাজ, ইংরেজ এবং মার্কিনরা পুনরায় আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করেছিল কিন্তু তারা জাতীয়তাবাদের তেজ সহ্য করতে পারল না। ১৯৫০ সালে ওলন্দাজরা ইন্দোনেশিয়া ছেড়ে যেতে বাধ্য হল। কম্বোডিয়া ফরাসী অধিপত্য থেকে মুক্তি পেল ১৯৫৩ সালে। সেই সঙ্গে দু'বছরের এক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় ১৯৪৮ সালে কোরিয়া দুটি স্বাধীন হিসাবে পরিগণিত হল। ইংরাজরা তাদের আধিপত্য মালয়ে ১৯৫৭ এবং সিঙ্গাপুরে ১৯৫৯ অবধি বজায় রেখেছিল। ১৯৪৯ সালে চৈনিক বিপ্লব জনগণের এক বিরাট জয়ের সূচনা করে।

ভিয়েতনামে হো-চি-মিনের নেতৃত্বে ১৯৪৫ সালে বিদ্রোহীরা ক্ষমতা দখল করল। ১৯৫৪ সাল অবধি তাদের লড়াই করতে হয়েছে ফরাসীদের বিরুদ্ধে যারা পুনরায় দেশটিকে উপনিবেশে পরিণত করার চেষ্টা করেছিল। তাদের হো-চি-মিন প্রতিহত করেছিলেন। ফরাসীদের পরাজয়ের পর এই বিদ্রোহীদের ১৯৭৫ সাল অবধি মার্কিনীদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল অ-কম্যুনিস্ট গোষ্ঠীকে মদত দেবার জন্য।

ভারত প্রথম থেকেই মার্কিনী দখলদারির বিরোধিতা করেছিল এবং হো-চি-মিনের কম্যুনিস্ট শাসনকে সম্পূর্ণভাবে স্বীকৃতি দিয়েছিল। এবং পশ্চিমী শক্তি যখন চীনকে U.N.O.-তে প্রবেশের অধিকার দিচ্ছিল না, ভারত তখন চীনকেই সমর্থন করেছিল।

৩১.৩.২ আফ্রিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম

আফ্রিকাতে উপনিবেশ উচ্ছেদের প্রক্রিয়ায় এশিয়ার সংগ্রামের থেকে আরও দীর্ঘ সময় লেগেছিল। সেই সংগ্রাম চলেছে নব্বই-এর দশক পর্যন্ত।

সম্প্রতি নামিবিয়া স্বাধীনতা অর্জন করেছে এবং দক্ষিণ আফ্রিকাতেও সম্প্রতি বহু রক্তক্ষয়ের পর ইউরোপীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের হাত থেকে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠদের দখলে এসেছে।

১৯৫০ থেকে ১৯৫৯ পর্যন্ত ৬টি আফ্রিকান দেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে এবং এই স্বাধীনতা সংগ্রামে ২,০০,০০০ আফ্রিকান নিজেদের আত্মাহুতি দিয়েছে।

১৯৬০ সালে আন্তর্জাতিক সাহায্যের ফলে আফ্রিকান জাতীয় মুক্তি যোদ্ধারা ইংরেজ, ফরাসী এবং বেলজিয়াম উপনিবেশ সাম্রাজ্যের পতন ঘটায়।

এই সময় ৩১টি দেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। ১৯৭০ সালে পর্তুগীজ সাম্রাজ্যের পতন এবং সাম্প্রাদায়িক বর্ণবিদ্বেষী গোষ্ঠীর পরাজয় জিম্বাবোয়েতে হওয়ায় বেশির ভাগ আফ্রিকান দেশগুলিতে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান হয়, এই স্বাধীনতা অর্জন করতে মানুষকে মূল্য দিতে হয়েছে প্রচুর। ভারতবর্ষ এইসব জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নৈতিক ও বস্তুগত সব হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। ১৯৬১ সালে গোয়ার স্বাধীনতা এবং '৭১-এ বাংলাদেশ মুক্তি যুদ্ধে অস্ত্র এবং মুক্তি যোদ্ধাদের অস্ত্র প্রশিক্ষণ দেবার কাজে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল।

দক্ষিণ আফ্রিকা এবং নামিবিয়াতে বর্ণদ্বেষী সাম্প্রদায়িক রাজত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্যে ভারত নৈতিক সমর্থন এবং সমর উপকরণ ও সামগ্রীগত সাহায্য করেছিল।

৩১.৩.৩ ভারতের স্বাধীনতার প্রভাব

পৃথিবীর অন্যান্য ঔপনিবেশিক রাজত্বের অবসান ঘটাতে, মুক্তি যুদ্ধের আন্দোলনে ভারতের সক্রিয় ভূমিকা এশিয় ও আফ্রিকার নেতাদের প্রশংসা অর্জন করেছিল এবং ওরা মনে করেন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং তার জয় অন্যান্য দেশগুলিকে অনুপ্রেরিত করতে সক্ষম হয়েছে।

আফ্রিকা এবং অন্যান্য এশিয় নেতারা মনে করেন যে, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সাফল্য সাদা-কালো পৃথিবীর মানুষেরই সাফল্য। স্বাধীনতা আন্দোলন বর্ণবৈষম্যে তত্ত্ব ধূলিসাৎ করে প্রমাণ করল যে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদকে তথাকথিত 'নিকৃষ্ট' মানুষদের দ্বারা দমন করা যায়।

প্রভাবের ধরন ঃ

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাফল্যে অভিজ্ঞতা ওদের মনে জোর বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং এই মনোভাব গণ আন্দোলন পরিচালনা করতে সাহায্য করেছিল। এছাড়া রাজনৈতিক দলগঠন এবং জনমত সংগ্রহের কাজেও তারা এই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছিল। কারাবরণ এবং ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধাচরণে ফাঁসির মঞ্চে জীবন বিসর্জন দেওয়ার আত্মত্যাগের দ্বারা অনুপ্রেরিত হয়েছিল। বহু এশিয় এবং আফ্রিকান নেতারা ইংল্যান্ড এবং রাষ্ট্রসংঘে পরস্পরের সংস্পর্শে এসেছিলেন। এই সব আলোচনায় এশিয় এবং আফ্রিকান নেতারা ভারতীয়